# স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২৪ সেপ্টেম্বর - ২০১২।। ৭ আশ্বিন - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

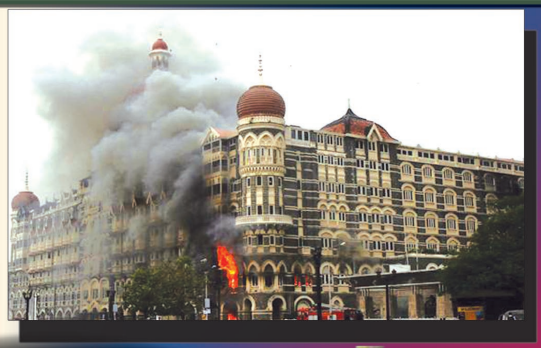

## সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ আর কতদিনে

## ১২৫তম জন্মবর্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বিদেশী লগ্নির ক্ষতিকারক দিকটি বোঝা যাবে □ ৯

নেতৃত্ব থেকে প্রভুত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল সিপিএম □ ১০

মানবতন্ত্র চর্চার আড়ালে হিন্দুধর্মকে চাঁদমারি □ সুখময় মাজী □ ১১

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নবমানবতাবাদী দর্শন ও তাঁর আবেদন □ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় □ ১৪

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের ঘটনাক্রমিক সংক্ষেপিত কালপঞ্জী □ ১৭

লৌকিক দেবতা মারাংবুরু □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

ঐতিহাসিক দুর্গ চিতোরগড় □ সোমশুভ্র চক্রবর্তী □ ২২

বৈষ্ণব সাধনার পরম্পরা □ রবীন সেনগুপ্ত □ ২৩

তেজস্বিনী তিনকন্যা কথা □ প্রীতি বসু □ ২৬

খোলা চিঠি : আসুন, আমরা সবাই মিলে বর্ষার মুণ্ডুপাত করি □ সুন্দর মৌলিক □ ২৭

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ আর কতদিনে হবে? □ শিবকুমার রায় □ ২৮

উত্তরপ্রদেশের সামাজিক সম্প্রীতিকে আড়াআড়ি ভাগ করে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টির সরকার □ ৩০

মহাভারত : মুখোশ উন্মোচন পর্ব □ শিবাজী গুপ্ত □ ৩২

দলে হিরো ঃ দেশে জিরো □ দেবব্রত চৌধুরী □ ৩৬

পাকিস্তান ঐতিহাসিক কটাসরাজ মন্দিরের সংস্কার করছে □ ৩৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ উত্তর-পূর্বাঞ্চল : ৩১ □ অন্যরকম : ২৭ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫ □ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ৭ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৪ সেপ্টেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা


প্রচ্ছদ নিবন্ধ

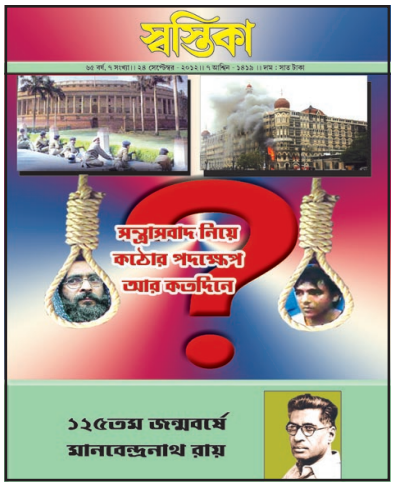


১২৫তম জন্মবর্ষে মানবেন্দ্রনাথ রায়


স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

**Postal Registration No.-** Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## স্মৃতির আলোয় সুদর্শনজী

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক মাননীয় কুপ্পহল্লি সীতারামাইয়া সুদর্শনজী। একদা সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক থাকার সুবাদে দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকেছেন তিনি। সেই সূত্রে কলকাতা তথা এরাজ্যের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাদের সঙ্গে যোগযোগ তাঁর বরাবরই নিবিড়, সরসঙ্ঘচালক হওয়ার আগে ও পরে, এমনকী জীবনের শেষ পর্যন্ত। তাঁর স্মৃতিচারণই এবারের স্বস্তিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এছাড়া অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই।

*।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।*


## ‘ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি’

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

### কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

**জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার**

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

**মোবাইল নং-95634-91576/76798-48846**

**ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ**

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

# সম্পাদকীয়

## আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ রুখিতে হইবে

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির মতো জ্বলন্ত ইস্যু তো ছিলই। সেইসঙ্গে রান্নার গ্যাসে ভরতুকি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিবিধ পণ্যের খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজি ছাড়, নবরত্ন রাষ্টায়ত্ত কোম্পানির বিলগ্নিকরণ, অসামরিক বিমান পরিবহণ ও সম্প্রচার বাণিজ্যে ঢালাও বিদেশি বিনিয়োগ বিষয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে সারা দেশ জুড়িয়া প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছে। আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জন্য এমনিতেই মানুষের জীবিকা জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর এইসব সিদ্ধান্ত তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া দিবে। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হইয়া পড়িবে। এইসব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই দেশ জুড়িয়া বিক্ষোভ মিছিল অবরোধ পালিত হইতেছে। ২০ সেপ্টেম্বর এন ডি এ-র ডাকে ভারত বনধ্ হইয়াছে। দেশের খুচরো ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও ধর্মঘটের পথে গিয়াছে।

জ্বালানিতে ভরতুকি তুলিয়া দেওয়া হইলে তাহা হয়তো জাতীয় অর্থনীতির উপর হইতে একটা বাড়তি চাপ কমাইয়া দেয়। কিন্তু পাশাপাশি সেই সিদ্ধান্ত আমাদের মতো দেশে যেখানে ৩০ কোটিরও বেশি মানুষকে এখনও একবেলা উপোস করিয়া কাটাইতে হয়, সেখানে মারাত্মক বিপদ ডাকিয়া আনে। অন্যদিকে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিতে ঘুরপথে সরকারের উপর বোঝা বাড়াইবে। কেননা ডিজেলের সব থেকে বড় উপভোক্তা ভারতীয় রেল ও ভারতীয় সেনা।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেও আমেরিকা ও ইউরোপ উল্লসিত। যে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' দিন কয়েক আগেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিল, 'নিকম্মা প্রধানমন্ত্রী', তাঁহার সরকার 'নীতি-নির্ধারণে পঙ্গু', তাহারাই এখন রাতারাতি ভোল বদলাইয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' স্পষ্টতই জানাইয়াছে, ইহার ফলে ভারতের মতো বিশাল বাজারে এখন বিদেশি কোম্পানিগুলি সহজেই প্রবেশ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা- ইয়োরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি অন্য রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনে যুদ্ধের বদলে সেই দেশের বাজার দখলকেই নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। যাহাকে 'আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ' (ইকনমিক ইম্পিরিয়ালিজম) বলা যায়। ভারতের বাজার দখল করিয়া শুধু মার্কিন ভোগ্য পণ্য একচেটিয়াভাবে বিক্রি করিতে পারিলে আমেরিকার কলকারখানাগুলি আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। সুতরাং, আমেরিকা-ইয়োরোপের উল্লসিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজিকে বিশেষত প্রযুক্তি ও কৌশলগত ক্ষেত্রে সমর্থন করা যাইলেও ইহা বিদেশি চাপের কাছে নতি স্বীকার ছাড়া আর কিছুই নহে। কবির সেই উক্তি 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে'—কথাটাই ইহা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি খুচরো ব্যবসায়ে ৫১ শতাংশে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ অর্থ লগ্নি করিবার অর্থ বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার পরিচালকরাই ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থার নীতি স্থির করিবে। স্বাভাবিকভাবেই তাহারা ভারতের নয়, নিজেদের দেশের স্বার্থই আগে দেখিবে। আবার ভারতের মাঝারি ও ক্ষুদ্র স্বদেশী শিল্প কারখানাগুলি বহুজাতিক কোম্পানীগুলির সহিত অসম প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাহারা সর্বস্বান্ত হইবে। যদিও টাটা-বিড়লা-মিত্তল-আম্বানি এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশ (ইতিমধ্যেই বিদেশীদের দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত)-র কোনও ক্ষতি হইবে না। এই কারণেই তাহারা এফ ডি আই-র সমর্থনে প্রতিযোগিতার নীতিকেই বাহবা দিতেছেন— ভারতীয় পরম্পরার সহযোগিতার নীতিকে নয়। ইহাকে সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'লুট লুট' বলিয়াছেন।

২০১১ সালে এফ ডি আই— চালু করিবার ঘোষণা করিয়াও বিরোধীদের চাপে ইউ পি এ সরকার তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই একই এফ ডি আই-কে এইবার কারও তোয়াক্কা না করিয়া ইউ পি এ সরকার আবার ঘোষণা করিয়াছে। দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য ইহা কার্যকর করিবে না জানিয়াও ইউ পি এ সরকার তাহা করিয়াছে। এই হামবড়াই-এর মূল্য চুকাইতেই হইবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে তাকাইলে এফ ডি আই-এর পরিণতির দিকটি স্পষ্ট হইবে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সব শিল্প পণ্যই তৈরি হয় বিদেশি মালিকদের দয়ায়। এই দুই দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হইলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শিকার। মনমোহন সিং এদের মতোই বিদেশি শিল্পপতিদের কাছে দেশকে বিক্রি করিয়া দিতে চাহিতেছেন। যে কোনও উপায়েই তাই অবাধ বিদেশী বিনিয়োগ নীতির প্রতিরোধ করিতেই হইবে। দেশকে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হইতে দেওয়া চলিবে না।

## জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

*ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি অস্পষ্ট অনুকরণ-মাত্র।*

*—স্বামী বিবেকানন্দ।*

# সুদর্শনজী প্রয়াত

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সুদর্শনজী আর নেই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক মাননীয় সুদর্শনজীর জীবনাবসান হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রাতঃভ্রমণ থেকে ফিরে প্রাণায়াম করার সময় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে রায়পুর সঙ্ঘ কার্যালয় 'জাগৃতি মণ্ডল'-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর এক সহোদর ভাই ও বোন বর্তমান। একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তিনি রায়পুরে এসেছিলেন। গত ১৩ সেপ্টেম্বর প্রাক্তন সাংসদ গোপাল ব্যাস রচিত 'সত্যমেব জয়তে' গ্রন্থটির উন্মোচন করেন। বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশজনিত রোগে তিনি অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। গত মাসেই মহীশূরে ভাইয়ের বাড়ীতে থাকার সময় প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ২০০০ সাল থেকে দীর্ঘ ৯ বছর তিনি সরসঙ্ঘচালক ছিলেন। ২০১০ সালের ১০ মার্চ নাগপুরে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে সরসঙ্ঘচালক অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিং (রজ্জু ভাইয়া) তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে সরসঙ্ঘচালক পদে তাঁর নাম ঘোষণা করেন। শ্রী সুদর্শন হলেন সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক। তাঁর পূর্বসূরীরা হলেন সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা তথা আদ্য সরসঙ্ঘচালক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী), বালাসাহেব দেওরস এবং রজ্জু ভাইয়া।

সুদর্সনজীর পুরো নাম কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ১৯৩১-এর ১৮ জুন তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব যৌবন শিক্ষাদীক্ষা সবই মধ্যপ্রদেশে। যদিও তাঁর পৈত্রিক ভিটা ছিল কর্ণাটকের মাণ্ড্যা জেলার কুপাল্লি গ্রামে। বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। জব্বলপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেলিকমিউনিকেশন-এ বি ই (অনার্স) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক। প্রথমে তিনি রায়গড় জেলা প্রচারক ছিলেন। ১৯৬৪ সালে মধ্যভারতের প্রান্ত প্রচারক হন। ১৯৬৯ সালে অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব লাভ করেন। জরুরি অবস্থায় তাঁর কারাবাসও হয়। তিনি ছিলেন ইন্দোর জেলে। পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্র প্রচারক রূপে তাঁর নিযুক্তি হয় ১৯৭৭

*শেষকৃত্যে উপস্থিত (বাঁদিক থেকে প্রথম সারিতে) অরুণ জেটলি, মোহনরাও ভাগবত, লালকৃষ্ণ আদবানী, বলবীর পুঞ্জ ও ভাইয়াজী যোশী।*

নাগপুরে শোক মিছিল।

সালে। ১৯৭৯ সালে হন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি হলেন অন্যতম সহসরকার্যবাহ।

পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্র প্রচারক হিসাবে কাজ করার সময় কলকাতা (৮৪, আশুতোষ মুখার্জী রোড) ছিল তাঁর প্রধান কার্যালয়। ফলে বাংলার বিশেষত কলকাতার স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ রকমের সম্পর্ক ছিল। বাংলাসহ পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব কয়টি ভাষা তিনি বলতে ও পড়তে পারতেন। কলকাতায় শহীদ মিনারে দক্ষিণবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের ও সুধীজনদের এক সমাবেশে তিনি বাংলা ভাষাতেই ভাষণ দেন। সঙ্ঘের কার্যালয়ে শারীরিক পটুতার উপর তাঁর বিশেষ জোর ছিল। কিন্তু অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ হওয়ার পর যে ধরনের গভীর বৌদ্ধিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেটা অনেকের কাছেই চমকপ্রদ।

সুর্দশনজীর একটা বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ছোট ছোট স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলাপচারিতায়ও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর আলাপচারিতায় ব্যক্তিগত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সহ-সরকার্যবাহ হিসাবে স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। মাঝে একবার তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সে যাত্রায় রক্ষা পেলেও তিনি নিয়মিত ওষুধ সেবন করতেন। সঙ্ঘের কাজের সূত্রে তাঁকে নিরন্তর সারাদেশ পরিভ্রমণ করতে হোত। এবং এজন্য তাঁকে বারকয়েক বিদেশেও যেতে হয়েছে। ২০০৯ সালে শারীরিক কারণে সরসঙ্ঘচালক পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান।

সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র তিনি ছিলেন আপনজন। পত্রিকার ছোট ছোট বিষয়গুলি সম্পর্কেও তিনি খোঁজখবর নিতেন। তাঁরই প্রেরণায় স্বস্তিকা অফসেট-এর যুগে প্রবেশ করে। স্বস্তিকা-র প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। ২০০৮-এর ১২ এপ্রিল মহাজাতি সদনে স্বস্তিকার হীরক জয়ন্তী উৎসবে তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা।

এদিন সন্ধ্যায় তাঁর মরদেহ রায়পুর থেকে বিশেষ বিমানে নাগপুরে নিয়ে আসা হয়। সাধারণ মানুষ যাতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন সেজন্য তাঁর মরদেহ রেশমবাগে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর 'স্মৃতি মন্দির' সংলগ্ন মহর্ষি ব্যাস হলে রাখা হয়। সুদর্শনজী তাঁর চোখ স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত মাধব নেত্র পেটি (আই ব্যাঙ্ক)-কে দান করেছিলেন। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে নাগপুরের গঙ্গাবাঈ ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর অন্তিম যাত্রায় শত শত সাধারণ মানুষসহ উপস্থিত ছিলেন সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী, রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা অরুণ জেটলি, বিজেপি সভাপতি নীতিন গডকরি, সহসরকার্যবাহ সুরেশ সোনীসহ সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ ও বৌদ্ধ সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা হয়। সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী জানানো হয় অন্তিম প্রণাম। এদিন গুয়াহাটি শিলিগুড়ি ভুবনেশ্বরসহ সারা দেশের বিভিন্ন শহরে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সুদর্শনজী ছিলেন একজন উচ্চ চিন্তাবিদ, দূরদর্শী, হিন্দু জাতীয়তার অগ্রণী পুরুষ। তাঁর প্রয়াণে দেশ এক নিবেদিত প্রাণ কৃতী সুসন্তানকে হারাল।

## সুদর্শনজীর স্মরণসভা

কলকাতায় ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় কেশবভবনে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে।

# চার লক্ষ বাংলাদেশী উধাও অসমে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। গত ২৬ বছরে প্রায় চার লক্ষ বাংলাদেশী অভিবাসী উধাও হয়ে গিয়েছে অসম থেকে। এই বিদেশী নাগরিকদের কোনও খোঁজ অসম সরকারের কাছে নেই। বিষয়টি নিয়ে বলাই বাহুল্য দীর্ঘদিন ধরে কোনও উচ্চ-বাচ্যও হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধুলো জমা ফাইল নাড়াচাড়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বছরের পর বছর ধরে প্রায় তিন ডজন ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে এরা 'অবৈধ অভিবাসী' বলে চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি তথ্য বলছে, ১৯৮৬ সাল থেকে ২০১২-র জুলাই পর্যন্ত এই ২৬ বছরে অসমে ৩৬টি ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৯০ জন অবৈধ বিদেশীকে চিহ্নিত করেছে। পরিসংখ্যানে এও দেখা যাচ্ছে যে, '৮৬ থেকে শুরু আজ অবধি প্রতি বছরই লাফিয়ে লাফিয়ে বেলাগামভাবে বাড়ছে অবৈধ বিদেশী চিহ্নিতকরণের সংখ্যা। '৮৬-তে যে সংখ্যা ছিল ৫০৩, বর্তমানে তা বাড়তে বাড়তে ২০১২-র জুলাইয়ে ২৭, ৯৮৮-তে পৌঁছে গিয়েছে। (সারণী দ্রষ্টব্য)। অসম পুলিশের ডিজি জয়ন্তনারায়ণ চৌধুরী মেনে নিচ্ছেন যে গলদটা গোড়ায়। তাঁর মন্তব্য, ''সন্দেহজনক বিদেশীদের হারিয়ে যাওয়ার বড় কারণ পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে না, যতক্ষণ না তারা বাংলাদেশি হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। এটা দীর্ঘ সময় নেয়, ট্রাইব্যুনালে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রজু হওয়া থেকে শুরু করে বিদেশী হিসেবে চূড়ান্ত চিহ্নিতকরণ অবধি। সন্দেহজনক মানুষজনদের হারিয়ে যাওয়ার আরও একটা কারণ হলো ট্রাইব্যুনাল আইন অনুযায়ী দীর্ঘ সময় ধরে এদের আটকে রাখার কোনও অধিকার পুলিশের নেই।'' শ্রী চৌধুরীর আরও বক্তব্য, এই আইন সংশোধনের জন্য কেন্দ্র-কেই সাংবিধানিক পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজ্যের কিছুই করণীয় নেই। কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে অপদার্থতার জন্য দুষেছেন অসম গণপরিষদের প্রধান এবং অসমের দু'বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহান্ত।

এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজ না মেলায় জনবিন্যাসের চরিত্রই বদলে গিয়েছে অসমের ছ'টি জেলায়, যথা— ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বরপেটা, নগাঁও, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। ১৯৭১-এ এদের মধ্যে মাত্র দু'টি জেলায় ছিল মুসলমান সংখ্যাধিক্য। ২০০১-এর জনগণনার রিপোর্ট-ই বলছে ৩০ বছরের ব্যবধানে ওই ৬টি জেলা প্রায় হিন্দুশূন্য, মুসলমানরাই বলা বাহুল্য সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৭১ সালে ধুবড়ি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৩৪.৮০ শতাংশ আর মুসলমান জনসংখ্যা ৬৪.৪৬ শতাংশ। ২০০১-এর জনগণনায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে দাঁড়াল ২৪.৭৪ শতাংশ, এবং মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭৪.২৯ শতাংশ। গোয়ালপাড়ায় ১৯৭১-এ হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৫০.১৭ শতাংশ, মুসলমান ৪১.৪৬ শতাংশ। ২০০১-এ সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা ৩৮.২২ শতাংশ, অন্যদিকে মুসলিম জনসংখ্যা ৫৩.৭১ শতাংশ। একইভাবে বরপেটাতেও ১৯৭১-এর গণনায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫১.১৯ ও ৪৮.৫৮ শতাংশ। ২০০১-এ ৫৯.৩৭ শতাংশ জনসংখ্যা নিয়ে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, হিন্দু জনসংখ্যা ঠেকেছে ৪০.১৯ শতাংশে। নওগাঁওতেও এই ঘটনার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতেও পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের নিরাপত্তার নিরিখে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে চার লক্ষ বাংলাদেশী উধাও হওয়ার ঘটনা যেমন সরকারি গাফিলতিকেই প্রকাশ্যে এনেছে, তেমনি ভবিষ্যতে অসমে আরও বৃহত্তম-র জাতি দাঙ্গার অশনি সংকেত বয়ে এনেছে।

**সারণী**

**জনবিন্যাসের পরিবর্তন**

| বছর | চিহ্নিত অবৈধ বিদেশী অভিবাসী |
|---|---|
| ১৯৮৬ | ৫০৩ |
| ১৯৮৭ | ১৮২৩ |
| ১৯৮৮ | ৬১১৪ |
| ১৯৮৯ | ৯৯৫০ |
| ১৯৯০ | ১১,৫২৭ |
| ১৯৯১ | ১১৮৮০ |
| ১৯৯২ | ১১৭০৯ |
| ১৯৯৩ | ১১৬৯১ |
| ১৯৯৪ | ১১৫০৯ |
| ১৯৯৫ | ১০৮৫০ |
| ১৯৯৬ | ১০৮২৯ |
| ১৯৯৭ | ১১৬৫১ |
| ১৯৯৮ | ১১২৯৩ |
| ১৯৯৯ | ১৩৫৭০ |
| ২০০০ | ১৪৩৩৭ |
| ২০০১ | ১৪১৯৭ |
| ২০০২ | ১৫৯৯৭ |
| ২০০৩ | ১৬৩৬৮ |
| ২০০৪ | ১৬২৩১ |
| ২০০৫ | ১৬৩৬১ |
| ২০০৬ | ১৬৩৯৮ |
| ২০০৭ | ১৬৯৪৯ |
| ২০০৮ | ১৬৭১৮ |
| ২০০৯ | ২২৬২৯ |
| ২০১০ | ২৪৭১৪ |
| ২০১১ | ২৭০০১ |
| ২০১২ (জুলাই পর্যন্ত) | ২৭৯৮৮ |

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

# পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে তাকালেই বিদেশী লগ্নির ক্ষতিকারক দিকটি বোঝা যাবে

শেষ পর্যন্ত বিদেশী শিল্পপতিদের কাছে দেশকে বিক্রিই করলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীকে একা দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি সোনিয়া কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত সেবক মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি স্থির করেন সোনিয়া গান্ধী। তিনিই কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী। মনমোহন সিংকে শিখণ্ডী খাড়া করে পিছন থেকে তির নিক্ষেপ করছেন কংগ্রেস নেত্রী। আর সব দোষের দোষী হচ্ছেন সরদারজী। ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবাধ বিদেশী বিনিয়োগের দরজা হাট করে খুলে দেওয়ার বিষময় পরিণাম দেশকে অবশ্যই ভুগতে হবে। অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছেন না বিদেশী লগ্নির ক্ষতিকারক দিকটি। এর জন্য অর্থনীতির পাঠ নিতে হবে না। চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান— বাংলাদেশের দিকে তাকান। সেখানের উৎপাদন বাণিজ্য পুরোপুরিভাবে বিদেশী শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে চলে। বিদেশী পুঁজি তুলে নেওয়ার হুমকি দিলেই দুটি রাষ্ট্রের অর্থনীতি ধসে যাবে। এ হচ্ছে এক ধরনের অর্থনৈতিক পরাধীনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এর জন্ম। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্র আমেরিকার শাসকরা বুঝে যান যে সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে দেশ জয় করার অনেক হ্যাপা। অন্য রাষ্ট্রের সম্পদ লুণ্ঠনই যদি দেশজয়ের লক্ষ্য হয়, তবে জমি দখল নয় শিল্প কারখানাগুলি দখল করে নাও। একে অর্থনীতির পরিভাষায় বলে 'ইকনমিক ইম্‌পিরিয়ালিজম' অথবা আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ। এই পথেই হেঁটে আমেরিকা— ইয়োরোপের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার দুর্বল আর্থিক কাঠামোর দেশের শিল্প বাণিজ্য তাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের পথে প্রধান বাধা ছিল ভারত। এই উপমহাদেশের বিশাল খোলা বাজার দখল করতে পারলে আমেরিকার এবং ইয়োরোপের চলতি ভয়াবহ আর্থিক মন্দার কবল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। ভারতের বাজার দখল করে শুধু মার্কিন ভোগ্যপণ্য এক চেটিয়াভাবে বিক্রি করতে পারলে আমেরিকার কলকারখাগুলি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান বাড়বে। আমেরিকা মন্দার প্রভাব থেকে মুক্ত হবে। ভারতের মতোই বৃহৎ দেশ চীন। কিন্তু কম্যুনিস্ট শাসিত চীনে বহুচেষ্টা করেও মার্কিন শাসকরা তেমন কব্জে পায়নি। চীন তার দেশের অর্থনীতির লাগাম বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়নি। মনমোহন সিং

গূঢ়পুরুষের

কলম

কোম্পানী যেভাবে দেশকে বিদেশীদের কাছে বেচে দিলেন সেভাবে চীনের শাসকরা দেয়নি। আমেরিকা চীনের মাটিতে লগ্নি করেছে। কিন্তু সেই লগ্নি অবাধ নয়। সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই কাজ করতে হয়।

প্রশ্নটা উঠছে, কেন্দ্রে কংগ্রেস শাসকদের এমন দুঃসাহস কীভাবে হয়। সংসদে ইউ পি এ জোটের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে বলেই কংগ্রেস জনস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশকে বিদেশী শিল্প শক্তির কাছে বিক্রি করে দিতে পারে? এর জবাব দিতে হবে ভারতের সাধারণ মানুষকেই। কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে যদি দেশজুড়ে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে তবে বিদেশী লগ্নিকারীরা ভয় পাবে। লগ্নিকারীরা দশবার চিন্তা করবেন যে দু'বছর পরে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরতে নাও পারে। সেক্ষেত্রে ভারতের শিল্প নীতিও পাল্টে যেতে পারে। তাই দেশপ্রেমী প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য বিদেশী বিনিয়োগ নীতির বিরোধিতা করা। মনে রাখতে হবে এই ভারতেই একদা বণিকের মানদণ্ড পরে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল। লখিন্দরের লোহার বাসরঘরের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়েই কালসর্প প্রবেশ করেছিল।

বিদেশী বিনিয়োগের সার্বিক বিরোধিতা করাটা ভারতবাসীর লক্ষ্য নয়। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনে বিদেশী লগ্নি স্বাগত। তবে দেশজ শিল্পোৎপাদনের পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে ভারতীয়দের হাতে। দেশের মানুষের স্বার্থেই শিল্পনীতি পরিচালিত হবে। আমেরিকা-ইয়োরোপের আর্থিক মন্দা কাটাতে ভারতের বাজারকে ব্যবহার করা চলবে না। মনমোহন সিং বলেছেন, বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলি খুচরা ব্যবসায়ে ৫১ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ অর্থ লগ্নি করতে পারবে। এর মানে, বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার পরিচালকরাই ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থার নীতি স্থির করবে। স্বাভাবিকভাবেই একটি বৃহৎ বিদেশী সংস্থাগুলি ভারতের মানুষের স্বার্থ দেখবে না। তারা তাদের স্বদেশের স্বার্থই দেখবে। কোনও সন্দেহ নেই যে ভারতের মাঝারি ও ক্ষুদ্র স্বদেশী শিল্প কারখানাগুলি আর্থিক শক্তিধর বহুজাতিক শিল্পসংস্থার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। সমূলে ধ্বংস হবে। টাটা-বিড়লা- আম্বানিদের তেমন ক্ষতি হবে না। কারণ, তারাও আজ যথেষ্ট শক্তিধর শিল্প মালিক। কিন্তু অসংখ্য ছোট বড় ভারতীয় শিল্পপতিদের কী হবে। তাঁরা মুছে যাবেন।

যেভাবে একদিন ইংল্যান্ডের বস্ত্র কারখানার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় বাংলার তথা ভারতের তাঁত শিল্পীরা মুছে গিয়েছিলেন। আমরা খুশি থাকবো বিদেশী ব্র্যান্ডের ভোগ্য পণ্য সহজেই লভ্য হওয়াতে। পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যাঁরা সফরে গেছেন তাঁরা জানেন সেখানের পথে শুধুই বিদেশী ব্রান্ডের গাড়ি চলে। আলপিন থেকে ওষুধ সবই তৈরি হয় বিদেশী শিল্প মালিকদের দয়ায়। ভারতের প্রতিবেশী এই দুই দেশ হয়তো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন। কিন্তু নিঃসন্দেহে এই দুই রাষ্ট্রই মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার। এদের বাইরে কোঁচার পত্তন, অন্দরে ছুঁচোর কেত্তন। এবার এই দলে যোগ দিচ্ছে ভারতবর্ষ।

# নেতৃত্ব থেকে প্রভুত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল সিপিএম

**নিশাকর সোম**

প্রথমেই দেখা যাক— বুদ্ধবাবুদের অবস্থা। যেটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে সাম্প্রতিক এক কর্মীসভায় বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, 'নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু তা বস্তুত প্রভুত্বে পরিণত হয়েছিল।' বুদ্ধবাবুর নিজের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। তিনি সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম শিল্পায়ন নিয়ে এক উন্মাদনায় মেতেছিলেন। তিনি জানতেন, পার্টির উচ্চতম সংগঠন পলিটব্যুরোর সদস্য তিনি নিজেও। আর কমিউনিস্ট পার্টি যতই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার কথা বলুক না কেন, পার্টিতে গণতন্ত্র কেন্দ্রিকতার দ্বারা পরিচালিত হয়। এ কথাটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সত্য। কমিউনিস্ট পার্টিতে কেন্দ্রীয় কমিটি কার্যত রিপোর্ট দেওয়ার সংস্থা। আসল ক্ষমতা পলিটব্যুরোর হাতে। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এক সময় সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সকল দেশের কমিউনিস্ট পার্টির গার্জেন ছিল। কেবলমাত্র চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তথা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর কোনও নির্দেশ পালন করেনি। মাও জে দুং নিজ দেশের অবস্থা অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি ঠিক করেছিলেন। চীনের বিপ্লব ১ অক্টোবর ১৯৪৯-এ শেষ হয়। তারপর মাও জে দুং-কে বার বার স্তালিন ডেকে পাঠান। তিনি অনেকদিন পরে মস্কো যান। রুশ সুপ্রিমো স্তালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খবর রটে যে, মাও চীন-রুশ চুক্তি করতে চাইছিলেন না। তাই কার্যত মাও-কে আটকে রেখে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছে। রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃত্বের কোপে পড়ে বহু নেতা-কর্মীকে কোতল করার কথা বলা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে পার্টির নেতা নিকিতা সার্গিয়েভ ক্রুশ্চেভ তাঁর রিপোর্টে একথা স্বীকার করেছিলেন। এরপর ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির নেতা তোগলিয়াও লিখলেন, 'এখন আর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক কেন্দ্র নেই, পলি-সেন্টার আছে।' আজকে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট নামধারী পার্টিগুলিরও ফেডারেশন অবস্থান। তাই কারাটের নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বুদ্ধবাবু নিজের ইচ্ছেমতো চলেছেন। তারই প্রতিফলন অমিতাভ নন্দী-রেজ্জাক মোল্লা। মাও-জে-দুং স্লোগান দিয়েছিলেন— 'সদর দপ্তরে (পার্টির) কামান দাগো' কিংবা 'বিদ্রোহী হওয়াটাই সঠিক।' যদিও এটার নকল করা এরাজ্য তথা ভারতে দেখা গিয়েছিল। এখন সিপিএম ক্ষমতার (শাসন ফেরত পাওয়ার আশায়) জন্য নেতৃত্বের লড়াই চলছে। উত্তর ২৪ পরগণায় গৌতম দেব-অমিতাভ নন্দী-এর লড়াই। গৌতম দেব বিমান-বুদ্ধর পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছেন। আর অমিতাভ নন্দীকে গোপনে সাহায্য করছেন শ্যামল চক্রবর্তী।

সিপিএম-পরিচালিত দুটি সংগঠন— ছাত্র ও

যুবরা তাদের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ পার্টির বাকল ছাড়িয়ে দিয়েছে। তাপস সিন্‌হাও বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমদের নীতির সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু-পার্টির ভিতরে নয়, পার্টির বৃত্তের সহযাত্রীরাও আজ বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমকে তীব্র সমালোচনা করছেন! পার্টিসংগঠনের নিষ্ক্রিয়তা তথা পার্টির বড় অংশের কর্মীরা বসে যাওয়ার মূল কারণও ৩৪ বছরের শাসনব্যবস্থায় পুলিশ-প্রশাসন নির্ভরতা। সংগঠন নিচের তলার প্রতিটি ক্ষুদে সিপিএম নেতা নিজেদের এক একজন মন্ত্রী ভাবতেন এবং সেইভাবে পুলিশ প্রশাসনকে নিজেদের স্বার্থে লাগাতেন। তার ফলেই আজ পুলিশ- প্রশাসনের সহায়তা না থাকার দরুন ভীত-সন্ত্রস্ত পার্টিকর্মীরা বর্তমান অবস্থা মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। অথচ একদিন কমিউনিস্টরা ভুল রাজনীতিকে আঁকড়ে ১৯৪২ এবং ১৯৬২-তে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া ৩৪ বছরের শাসনে চাঁদা-দান (পড়ুন তোলা) সংগ্রহ করতে করতে পার্টিকর্মীরা এক একজন নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে 'হার্মাদ' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কাজেই এ পার্টির উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব।

বর্তমান রাজ্য-সরকার অনেক ক্ষেত্রে পরাজিত সরকারের ছেঁড়া জুতোয় পা-গলাচ্ছে না কি? চিফ সেক্রেটারি সমর ঘোষকে আরও ছ'মাস এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কি হস্তক্ষেপ করছেন?

সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যপরিষেবা, পানীয় জল সহজলভ্য করা, সস্তায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দিকে রাজ্য সরকার যত না মন দিচ্ছে তার থেকে বেশি প্রকল্পের পর প্রকল্প ঘোষণা করছে। বিভিন্ন ভাতা প্রদান ঘোষণা করা হচ্ছে। মন্ত্রিসভায় নির্যাতিত রাজনৈতিক-কর্মীদের ভাতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে 'সিপিএম-ক্যাডারভাতা' বলা হচ্ছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, যাঁরা নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী ভাতা পান— তাঁরা কেউই এখন সিপিএম ক্যাডার নন। কারণ তাঁদের গড় বয়স ৭০-৯০ বছর। এঁদের মধ্যে প্রাক্তন আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্মী। ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই, আর এস পি আই, প্রাক্তন নকশাল, বৃটিশ আমলে নৌবিদ্রোহী আছেন। এই সরকারি ভাতায় এঁরা কোনক্রমে দিন গুজরান করে থাকেন। এঁদের ভাতা বন্ধ করার অর্থ হলো মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া। গৌতম দেব সরকারি আবাসনকে ধীরে ধীরে বসবাসকারীদের মালিক করে দিচ্ছিলেন। তাতে সরকারের আবাসনের ব্যয়ভার কমেছিল এবং সরকারি কোষাগারে এই ফ্ল্যাট-বিক্রির টাকা (মাসিক-কিস্তিতে) জমা হচ্ছিল। এ সরকার কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চুপ! প্রসঙ্গত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির প্রাথমিক ব্যবস্থা হলো চতুর্থশ্রেণীর কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনা। কিন্তু তা হয়নি— এখনও তাঁরাই হাসপাতালের নিয়ন্তা।

সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ টেন্ডার-এর ব্যাপারে একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে— তা'হলো বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা লেনদেনকারীদেরই টেন্ডার দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ৮ জন এরকম 'টেন্ডারদাতা' এসেছেন। পুরানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেন্ডারদাতাগণ বঞ্চিত হয়ে আর্থিক কষ্টভোগ করছেন।

রাজ্যে অসামাজিক কার্যের সংখ্যা ২৯, ১৩৩টি। মমতা-সমর্থক তরুণ সান্যাল মন্তব্য করেছেন 'সদিচ্ছাযুক্ত শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশস্তিকারী বাহিনী ঘিরে আছে। সেই বিষকুম্ভ সুভদ্র মুখ কর্মীবৃন্দ তাঁকে ভুল পথে পরিচালনা করছেন।' রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক-সংবাদপত্রের কাউনসেলিং-এর কথা বলেছেন— এ পর্যন্ত এ-রাজ্যে কোনও মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেননি। এমনকি জরুরি অবস্থাতেও বলা হয়নি।

# মানবতন্ত্র চর্চার আড়ালে হিন্দুধর্মকে চাঁদমারি

**সুখময় মাজী**

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠক্রমে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল রচিত 'মানবতন্ত্র' প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রের পটভূমিকায় ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাপেক্ষে মানবতার অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে ধর্মের বিস্তারিত সমালোচনা করলেও ধর্মনিরপেক্ষতার বিপক্ষে তেমন জোরদার যুক্তি তুলে ধরতে পারেননি। অথচ মুড়ি মিছরি এক করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, যারা সেক্যুলার নয় তাদের শত্রু ভাবতে সেক্যুলারিজম বিশ্বাসীর মোটেও বাধে না। এটা হয়ত সত্য, কিন্তু এই শত্রুতার সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিদ্বেষের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লেখক-ই বলেছেন, ধর্মগ্রন্থে যদি নির্দেশ দেওয়া থাকে যে, বিধর্মীকে কোতল করলে তোমার জন্য বেহেস্তে সর্বোত্তম কামরাটি খাস রাখা হবে, তাহলে ধার্মিকজন সুযোগ পেলে নির্দেশ পালন করতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। এই একই কথা কি সেক্যুলারিস্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সেক্যুলারিস্ট চেতনায় অন্য ধর্মের ভাবাবেগকে আঘাত না করে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবাধ ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত। অতএব, ইসলামি ধর্মতন্ত্রের তুলনায় সেক্যুলারিজম যে অনেক বেশি উদার মতবাদ এবং মানবতন্ত্রে পৌঁছানোর পথে এটা উপমহাদেশের অন্যতম অবলম্বন হতে পারে, এটা প্রবন্ধে স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়া দরকার ছিল। (শুধুমাত্র ইসলামের কথা উল্লিখিত হলো এই কারণে, যে, লেখক কর্তৃক উল্লিখিত উদাহরণটি শুধু ইসলামেই দেখা যায়, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন বা শিখ ধর্মে এরকম কোনও নির্দেশ নেই)। লেখক যথার্থই বলেছেন, মানুষকে অমানুষিকতার হাত থেকে বাঁচাতে

**ইসলাম অথবা খৃস্টান ধর্ম যেমন বিশেষ এক এক জন মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং বিশেষ গ্রন্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধর্ম, হিন্দুধর্ম কিন্তু তেমন নয়। যে অর্থে ইসলাম অথবা খৃস্টান ধর্মকে ধর্ম বলা হয় সেই অর্থে হিন্দুধর্ম কোনও ধর্ম নয়। হিন্দুধর্ম উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর কয়েক হাজার বছরের জীবনচর্যার এক স্বাভাবিক ও চলমান পরিণতি। এই মূলগত পার্থক্যটি মনে না রাখার জন্যই যে কোনও ধর্মের আলোচনার সময় সম্পূর্ণ অকারণে হিন্দুধর্মকে টেনে এনে তাকে চাঁদমারি করা হয়, আর প্রগতিশীল সাজার তাগিদে বুদ্ধিজীবীরা সরবে অথবা নীরবে সেগুলি সমর্থন করেন।**

হলে মানবতাকে করতে হবে অবলম্বন। কিন্তু এই উপমহাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন যেখানে ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর মোল্লা-মৌলভী, নেতা ও পুরোহিতদের নির্দেশের জালে আবদ্ধ, সেখানে সরাসরি মানবতায় পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। সেজন্য ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই প্রচারিত হওয়া দরকার। মানবতায় উত্তরণের পথে সেক্যুলারিজমই উপযুক্ত সোপান। লেখক দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলেছেন, সাম্প্রতিক ইতিহাসে এটা খুব ভালোভাবেই দেখা গেছে যে, ধর্ম বা সেক্যুলারিজম কোনওটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারেনি। ধর্ম যে মানুষকে বাঁচাতে পারেনি তার প্রমাণ দু-দুটো ক্রুসেড, যেখানে ইসলাম আর খৃস্টান সম্প্রদায়ের আগ্রাসনের লড়াই কেড়েছিল বহু মানুষের প্রাণ। প্রমাণ, বিশ্বব্যাপী আজকের তথাকথিত জেহাদ। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা যে মানুষকে বাঁচাতে পারেনি, এই তথ্য লেখক পেলেন কোথায়? এতবড় একটা সিদ্ধান্ত তথ্য ও প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন ছিল না কি? আসলে, জন্ম থেকেই পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশে একটা বিতর্ক জনমানসে ফল্গুধারার মতো বহমান— রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ কী হওয়া উচিত? ধর্ম না কি ধর্মনিরপেক্ষতা। লেখক কোনও পক্ষাবলম্বী হিসাবে চিহ্নিত হতে না চাওয়ার তাড়নাতেই সম্ভবত মুড়ি মিছরি এক করেছেন এবং সচেতনভাবেই করেছেন। অথবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের পালের হাওয়া কাড়তেই ধর্ম ও সেক্যুলারিজমকে একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে দুই-ই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাছাড়া, ইসলাম ও খৃস্টধর্মের ধ্বংসাত্মক রূপ দেখে সব ধর্ম সম্বন্ধে এই মন্তব্য করা তো অতি সরলীকরণ। ধ্বংসাত্মক সব কাজেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়। তা থেকে সিদ্ধান্ত করে নেব, বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারেনি! সম্রাট অশোকের 'ধম্ম'

মানুষকে বাঁচিয়েছে, হত্যা করেনি। ইসলামের তরবারি ভারতবর্ষে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, এর কারণ সামরিক শক্তি নয়, ধর্মই। ধর্মের কারণেই ৮০০ বছরে ইসলামি শাসন ও ২০০ বছরের ইংরাজ শাসন ভারতীয় সভ্যতাকে শেষ করতে পারিনি, যেটা ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যে করতে পেরেছ, ইউরোপীয়রা পেরেছে আমেরিকা, নিউজিল্যান্ড সহ বহু দেশে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখক মন্তব্য করেছেন, ''প্রাণপণে দুই বিপরীত ধর্ম পালন করে কোথাও মিল হয়েছে— এমন নজির আমার জানা নেই। দুই ধার্মিকের সত্যকার সখ্য বা আন্তরিকতাও বিরল ঘটনা। হিন্দু মহাসভা, আর জমা' আতে ইসলাম একই মঞ্চে মিলিত হয়ে একই কর্মসূচীতে হাত মেলাবে এ কল্পনার বাইরে''। এটা বলতে গিয়ে লেখক বাংলার ইতিহাসের একটা ছোট্ট সময়কালের কথা বিস্মৃত হয়েছেন। মুসলিম সমর্থনপুষ্ট কৃষক প্রজা পার্টি ও হিন্দু মহাসভার মিলিত স্বল্প স্থায়ী শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা জনকল্যাণকামিতার দিক থেকে সম্ভবত বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সরকার, যে অখণ্ড বাংলাদেশই হোক, বা দ্বিখণ্ডিত বাংলাই হোক। অবশ্য জমা আতে ইসলাম, কৃষক প্রজা পার্টি বা হিন্দু মহাসভার সদস্যরা 'প্রাণপণে' ধর্ম পালন করে কী না, সেটা বলা মুশকিল।

''বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানিত্ব ও হিন্দুয়ানিকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানে যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা'ও এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল''। এই উদাহরণেও ঘটেছে সত্যের অপলাপ। প্রবন্ধটির রচনাকাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এরকম কয়টি ঘটনা ঘটেছে? বরং উল্টোটাই সত্য। হিন্দু পুরুষ ও মুসলমান রমণীর বিবাহের ঘটনা মাইক্রোস্কোপের তলাতেও দেখা যাবে না। (সম্ভবতঃ এর একটা বড় কারণ, সবার মতই হিন্দু পুরুষও বেঘোরে অকালে পৈতৃক প্রাণটা হারাতে চায় না)। অন্যদিকে হিন্দু মহিলা ও মুসলমান পুরুষে বিবাহের ঘটনা অনেক ঘটলেও সেই মহিলাকে ইসলাম কবুল করতে হয়নি এরকম বিরল ঘটনার উল্লেখ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও খুঁজে পাননি, পেলে হবিব খাঁর মতো উদার মানুষের কাছে আশ্রয়প্রাপ্তা কমলাকে করিমকে পাওয়ার জন্য মুসলমানী হওয়ার প্রস্তাব দিতে হোত না। মুসলিম পুরুষের হিন্দু রমণীকে বিবাহের পিছনে ব্যক্তিগত আকর্ষণ, প্রণয় অথবা জবরদস্তি— এগুলি-ই বিষয়, ওসব মানবতা-টানবতার প্রশ্ন অবান্তর। বরং বহু ক্ষেত্রে এটা ইসলামের আগ্রাসী মনোভাবের-ই প্রকাশ। কাফের মহিলাকে বিবাহ করে তাকে আল্লার ধর্ম কবুল করানো ইসলামে এক পুণ্যকর্ম। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক 'লাভ জেহাদে'র কথা স্মরণ করুন।

তাছাড়া, ''বরং মানুষ যখন এবং যেখানে প্রচলিত মুসলমানিত্ব ও হিন্দুয়ানিকে ছাড়িয়ে গেছে সেখানে মিলন সহজ ও অবাধ হয়েছে''— এই মন্তব্যও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। এই কথা হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে অন্তত প্রযোজ্য নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে মানবতার কোন বিরোধ নেই। কেননা এই ধর্মই সব ধর্মকে সত্য বলে স্বীকার করে ও সব ধর্মমতকে সমান সম্মান করে। ইসলামের মতো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবিশ্বাসী বলে অভিহিতও করে না, খৃস্টান ধর্মের মতো মানুষেকে জন্মগতভাবে পাপীও বলে না। রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' অথবা উপনিষদের ''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'' এগুলি নিঃসন্দেহে মানবতারই কথা বলে, বিচ্ছিন্নতার বা বিদ্বেষের নয়। মানুষকে কাছে টেনে নিতে রামকৃষ্ণদেব বা মা সারদাকে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করতে হয়নি। হিন্দুয়ানি বজায় রেখেই মা সারদা মার্গারেট নোবেল-কে আদরের খুকি করে নিতে পেরেছিলেন। আমজাদকে সন্তানের জায়গায় বসাতে পেরেছিলেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মানবতার বিরোধ নেই বলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুশীলন সম্ভব হয়েছে। (যদিও আজ ধর্মনিরপেক্ষতা আর সংখ্যালঘু তোষণ ভারতের রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীদের কাছে সমার্থক)। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ মারমুখী হয়ে ওঠার প্রয়োজন মনে করেনি। এর বিপরীত উদাহরণ তো উপমহাদেশের অন্য দুটি দেশের ইতিহাসেই রয়েছে। কাজেই লেখকের উক্ত মন্তব্য অসার। তবু লেখক এই মন্তব্য করেছেন, তার কারণ হিন্দু ধর্মের সমালোচনা (অযৌক্তিক হলেও) না করে শুধু ইসলামের দিকে আঙুল তুললে (যতই যৌক্তিক হোক না কেন) তার পরিণতি লেখকের পক্ষে মধুর হত না। আবুল ফজল যা বুঝেছিলেন, পরবর্তীকালে তসলিমা নাসরিন তা বোঝেননি বলেই তাঁকে আজ দেশ ছাড়া হতে হলো; এমনকি প্রতিবেশী দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল ও অতিথিবৎসল সরকারও তাঁকে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই দিতে পারল না; সাময়িক আশ্রয়ের জন্যও তাঁকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়ে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'মৌলবাদী' দল শাসিত রাজস্থানে তাড়ানো হয়েছিল। ''সযত্নে নিজের মুসলমানিত্ব কী হিন্দুয়ানিও রক্ষা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবেও বড় ও মহৎ হব— এ হয় না, যেমন হয় না নিজ নিজ পুকুরে গোসল করে সমুদ্র স্নানের স্বাদ পাওয়া''— এই বক্তব্যও যে অসার, তা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই প্রমাণিত করতে পেরেছি। আসলে লেখক পুকুর ও সমুদ্রের স্বরূপ হয় নিজে বোঝেননি অথবা পাঠককে বুঝতে দিতে চাননি। ইসলাম অথবা খৃস্টান ধর্ম যেমন বিশেষ এক এক জন মহাপুরুষ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং বিশেষ গ্রন্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধর্ম, হিন্দুধর্ম কিন্তু তেমন নয়। যে অর্থে ইসলাম অথবা খৃস্টান ধর্মকে ধর্ম বলা হয় সেই অর্থে হিন্দুধর্ম কোনও ধর্ম নয়। হিন্দুধর্ম উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর কয়েক হাজার বছরের জীবনচর্যার এক স্বাভাবিক ও চলমান পরিণতি। এই মূলগত পার্থক্যটি মনে না রাখার জন্যই যে কোনও ধর্মের আলোচনার সময় সম্পূর্ণ অকারণে হিন্দুধর্মকে টেনে এনে তাকে চাঁদমারি করা হয়, আর প্রগতিশীল সাজার তাগিদে বুদ্ধিজীবীরা সরবে অথবা নীরবে সেগুলি সমর্থন করেন। আলোচ্য লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে লেখকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আবার, নিজ ধর্ম সম্বন্ধেও যে লেখকের জ্ঞান অগাধ, তাই বা বলতে পারছি কই? লেখক এক জায়গায় বলেছেন, ''নিরাকার ঈশ্বরের মত ধর্মের বৃহত্তর আদর্শ বা আবেদনও থেকে যায় ওদের

কাছে তাই অনুপলব্ধ”। অথচ নিজে মুসলমান এবং শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাব উনি নিশ্চিতভাবেই জানেন, মুসলমানের ঈশ্বর নিরাকার নন। ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্বে পাই ‘‘...তাই দিয়ে তিনি নিজ আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের সমান করে ষাট হাত লম্বা হজরত আদমের মূর্তি তৈরি করলেন”। (মুসলীম-৬৮০৯)। কোরানে আল্লাহর হাতের কথা আছে। (সূরা ফাতহ-১০) কোরানে চোখের কথা আছে। পায়ের কথা আছে। কোরানে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে চূড়ান্তভাবে একটা কথা বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি করা কারো মতো না। (সূরা ইখলাস-১১২:৪)। সূরা আনআম-৬:১০৩ নং আয়াত অনুযায়ী আমরা আল্লাহকে দেখতে পারব না। তবে জান্নাতে মুসলিমরা আল্লাহকে দেখতে পাবে। এছাড়াও কিয়ামতের দিন সুরা কিয়ামাহ-এর ২৩ নং আয়াত অনুযায়ী আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লা নিরাকার হলে তাঁকে দেখার প্রশ্ন আসত না নিশ্চয়ই। তাছাড়া লেখক নিজে যখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, ‘‘ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাই কে হিন্দু আর কে মুসলমান এ বোধটাকে বড় করে তোলে”, তখন তিনি নিজে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মুসলমানের আনুষ্ঠানিক পরিচিতিসূচক দাড়ি রেখেছিলেন কেন সেই ব্যাখ্যাও পাঠকের কাছে তুলে ধরা উচিত ছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার যে কথা লেখক বলেছেন, তার সঙ্গে একমত হওয়াই যায়। কিন্তু এখানেও লেখক হিন্দুধর্মের ক্রমপরিবর্তনশীলতার দিকটি এড়িয়ে গেছেন। সপ্তম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের বিধানে একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি। কারণ এরকম পরিবর্তন ওই ধর্মেই নিষিদ্ধ। অথচ হিন্দুধর্ম ও সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একসময়ের সতীদাহ প্রথা আজ নেই। বহুবিবাহ আজ শুধু আইনগত অপরাধ নয়, সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ হিসাবেও গণ্য। বুদ্ধ, মহাবীর চৈতন্য, রামানুজ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ মনীষীগণ হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন এনেছেন। হিন্দু ধর্মও নির্দ্বিধায় এই পরিবর্তনগুলিকে আত্তীকরণ করেছে। বুদ্ধকে অবতারের আসনে বসিয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রে কিন্তু ধর্মসংস্কারের জন্য আর কোনও মহাপুরুষের আসার রাস্তা বন্ধ। ইসলামে পরিষ্কার বলা আছে, মুহম্মদ(সা)ই শেষ নবী; আর কোন নবী আসবেন না।

লেখকের পরস্পরবিরোধিতার নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে প্রবন্ধটির যত্রতত্র। উনি প্রথমেই বলেছেন, ‘‘ধর্মও বা সেক্যুলারিজম কোনওটাই মানুষকে বাঁচাতে পারে না, পারেনি”। অথচ পরে আবার বলছেন, ‘‘ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সামাজিকভাবে ধার্মিক হওয়ার যে আমি বিরুদ্ধে তা নয়”। প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক—কেন নয়? আপনি যদি জানেনই, ধর্ম মানুষকে বাঁচতে পারে না, তাহলে শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ হিসেবে কেন আপনি তার বিরোধী নন? আবার প্রবন্ধটিতে আগাগোড়া ধর্মের সমালোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন ধর্ম মাত্রই মানবতাবিরোধী, অথচ অন্যত্র বলছেন, খাঁটি অর্থে যারা ধার্মিক তারা কখনও নিজের কী অপরের মনুষ্যত্বকে আঘাত হানতে পারে না— পারে না মানবতাকে কিছুমাত্র খাটো করতে। লেখকের এই অবস্থানটাই তো স্ববিরোধী। ধর্মের ‘সত্যকার’ নৃশংস স্বরূপ উন্মোচন করলেন এত কষ্ট করে, মানবতার একশ’ আশি ডিগ্রী বিপরীতে তাকে এত মেহনত করে টেনে আনলেন; শেষে সেই ধর্মের কাছেই মানবতা আশা করছেন! এর দ্বারা তিনি নিজেই প্রমাণ করলেন এতক্ষণ পর্যন্ত নিজে যা লিখেছেন, সবই আবোলতাবোল। নাকি এতদূর পর্যন্ত এসে তাঁর স্বধর্মীয় মৌলবাদীদের অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা মনে পড়ে গেল? তাদের তোয়াজ করতেই এই মলমের ব্যবস্থা!

আবার দেখা যাচ্ছে, দশম অনুচ্ছেদে উনি বলছেন, ‘‘ধর্মজীবনের ব্যাপ্তি সামাজিক জীবনে ছড়িয়ে না পড়লে তার মূল্যই বা কতটুকু?” অথচ পরের অনুচ্ছেদেই উনি বলছেন, ‘‘অপার্থিব তথা আধ্যাত্মিকের প্রেরণা ও তৃষ্ণা মানুষ যে একেবারে অনুভব করে না বা তার কোনও প্রয়োজন নেই তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, তা ব্যক্তিগত সাধনা ও উপলব্ধির ব্যাপার। তাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে টেনে আনায় আমার আপত্তি, টেনে আনলে শুধু সামাজিক জীবন নয়, আধ্যাত্মিক জীবনও নাজেহাল হয়”। তিনি আগেই বলেছেন, ‘‘অলৌকিকতার উপর ধর্মও আর তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি দাঁড়িয়ে আছে”। অতএব, সামগ্রিকভাবে লেখক কি তার যুক্তি অপযুক্তির গোলকধাঁধাতেই হারিয়ে গেলেন না? ওই অনুচ্ছেদেই লেখক যখন বলেন, ‘‘কেতাবের ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর”, তখন একমত হওয়াই যায়, কিন্তু তারপরই যখন বলেন, সব ধর্মের বেলায় একথা সত্য, তখন প্রতিবাদ করতেই হয়। কেননা আগেই প্রমাণ করেছি, এগিয়ে চলা সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হিন্দু ধর্মের ও সমাজের পরিবর্তনশীলতা আর ইসলামের বিধানের অনমনীয়তা।

সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করলে কিছু আপাত সুন্দর কথাবার্তা পাওয়া যায়, কিন্তু সঠিক যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা সমর্থিত কোনও বক্তব্য, যা প্রবন্ধের প্রধান গুণ, পাওয়া যায় না। সঙ্গত কারণেই এখান থেকে শিক্ষণীয় কিছু যে ছাত্রছাত্রীরা পাবে এই আশাও অসঙ্গত। তবু কী মহৎ উদ্দেশ্য সংসদ এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছেন বোঝা দায়। এ কি সংখ্যালঘু তোষণের অন্যতম কৌশল নাকি বাংলাদেশের একজন লেখককে পাঠ্যতালিকায় রেখে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়াস, নাকি দুটোই! তবে সবচেয়ে অবাক লাগে প্রাজ্ঞ শিক্ষকগণ যখন স্বাধীন চিন্তাভাবনার অনুশীলন না করে বাজারচলতি সহায়িকার দেখানো পথে এই প্রবন্ধকে মানবতার ম্যানিফেস্টো বানাতে চান ও লেখককে গদগদ চিত্তে বানাতে চান মহান ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বানাতে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

*(লেখক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক)*

# মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নবমানবতাবাদী দর্শন ও তাঁর আবেদন

**অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়**

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হবার পর বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষ এবং সেই নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্রতী কিছু মানুষ যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল, লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব সেই স্বপ্নেরই প্রথম বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ। কিন্তু সেই বিপ্লবের পর সাতটি দশক কেটে গেল—তথাকথিত বিপ্লব আরও কয়েকটি দেশে সংঘটিত হলো— সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের সংখ্যাও বাড়লো— ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ক্ষমতাও অর্জিত হলো; কিন্তু যাদের জন্য সমাজতন্ত্রের কথা, যে লক্ষ্যের জন্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উদ্ভব ও প্রসার তা পূরণ হয়নি শুধু নয়, পূরণের আশা বিদূরিত হয়েছে— শোষণ মুক্তির নামে ভীষণতর শোষণযন্ত্র চেপে ব'সেছে কমিউনিস্ট দেশের মানুষগুলির উপর। সর্বত্রই ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। কিন্তু কেন এমন হলো এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগান ছিল, যাদের স্লোগান ছিল মেহনতী মানুষের কোনও বিশেষ দেশ নেই সেই কমিউনিস্ট দেশগুলিই আজ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত। কোথাও ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে, কোথাও আদর্শচ্যুতির অভিযোগ নিয়ে। কিছু ব্যক্তি বিশেষকে আসামীর কাঠগোড়াতে দাঁড় করালে তা শেষ অবধি ধোপে টিকবে না— তাহলে কি যে চালিকা দর্শনের উপর ভিত্তি করে দেশগুলি অগ্রসর হয়েছিল শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে সেই দর্শনেই কোনও গলদ ছিল? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই যার কথা আজ অন্তত আমাদের দেশে মনে পড়া উচিত তার নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়। ১৯৮৭ সালে যার জন্ম শতবর্ষ উদযাপিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ঢক্কানিনাদসহ সমারোহে নয়, কোলাহলে নয়, কিছুটা নীরবে ও আত্মসমীক্ষার পটভূমিকায়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের (প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রথম পরিলক্ষিত হয় ১৯২০ সালে পেট্রোগাডে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে। লেনিনের বিশেষ আমন্ত্রণে রায় গিয়েছিলেন সেখানে। লেনিন তাঁর রচিত উপনিবেশ সংক্রান্ত দলিলটি সমীক্ষার জন্য দিয়েছিলেন রায়কে। রায় কিন্তু একমত হতে পারলেন না। লেনিনের যুক্তি তিনি খণ্ডন করলেন। কী নির্ভীক ও নিরপেক্ষ চিন্তা! রাশিয়াতে ব'সে সেই 'লৌহ যবনিকার' দিনগুলিতে রাশিয়ান বিপ্লবের প্রধান নেতার বিরোধিতা— কিন্তু সেই বিরোধিতা তাঁকে করতে হয়েছিল মূল লক্ষ্যের দিকে চেয়ে, মানুষের মুক্তির জন্য, সঠিক পথের অনুসন্ধানে জন্য। রবার্ট সি নর্থ-এর বর্ণনায় [Soviet Survey No 32 April June 1960] পাই... 'Now the new convert (Roy) Stood face to face with Lenin and boldly challenged the views of Bolshevism's most seasoned strategist and theoritician....After considerable debate the second congress sought to resolve the argument by approving both theses." রায়ের বিকল্প তত্ত্ব 'Decoloniation thesis' নামে খ্যাত হয়ে আছে। স্বীয় প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন— ১৯২৩ এ কমিনটার্ণ প্রেসিডিয়াম সদস্য, ১৯২৬-এ প্রাচ্য কমিশনের সভাপতি, Org Burea-এর সদস্য ও চীন কমিশনের সম্পাদক নির্বাচিত হন। স্ট্যালিন কর্তৃক চীনে উপদেষ্টা হিসেবে প্রেরিত হন। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে

এই ঘনিষ্ঠ সংযুক্তি, আন্দোলনের দর্শন, গতি প্রকৃতি, রূপ ও রূপান্তর সম্পর্কে তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত ক'রে তোলে। মূল দর্শন সম্পর্কে তাঁর মোহ ভাঙ্গতে থাকে। উদগ্র ক্ষমতালিপ্সা, সংকীর্ণতা, অমানবিক পদক্ষেপ অনেকেই একদা বরণীয় মার্কসীয় দর্শনের পুনর্মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হন। নিষ্পেষিত ব্যক্তি মানুষের অস্বীকৃতি, অবমাননা বিখ্যাত তাত্ত্বিক নেত্রী রোজা লুকেসমবার্গকে কতটা বিচলিত

*কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন, গোর্কি, জিনোভিয়েভ প্রভৃতির সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ,*

মার্কসবাদের নামাবলীর তলা থেকে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় চোদ্দ বছর বয়সেই অজানা বিপদ সংকুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন সেই মুক্তির প্রত্যাশার অপমৃত্যুর সম্ভাবনা রুখতেই তিনি নতুন পথের সন্ধান করতে থাকেন। নবমানবতাবাদী দর্শন তারই ফলশ্রুতি। মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে গ্রথিত কমিউনিস্ট মতবাদের ভিত্তি স্তম্ভগুলির দৌর্বল্য তাঁর চোখে ধরা পড়ে। সমসাময়িক কালের করেছিল তা পাই —

'Russian Revolution--Ross Luxemberg speak's এ..."Freedom only for the supporter of the government, only for the members of one party however numerous they may be--is no freedom at all. Freedom is always and exclusively freedom for the one who thinks differently. Not because of any financial concept of 'Justice' but because all that is instructive whole some and purifying in political freedom depends on this essential characteristic and its effectiveness vanishes when freedom becomes a special previlege... Freedom এর এই অবস্থা বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। সেই সময়ে স্বাধীনতা খর্ব করার যুক্তি যাই দেওয়া হোক না কেন পরবর্তীকালেও সে স্বাধীনতা আর ফিরে আসেনি। এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক শাখারোভের ব্রেজনেভকে দেওয়া একটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে— "Freedom of information and creative labour are necessary for the intelligentia due to the nature of its activities, due to the nature of its social function. The desire of the intelligentia to have greater freedon is legal and natural. The state however supresses the desire by intrioducing various restrictions, administrative pressures, dismisals and even the holding of trial." (News week 13.4.70) বিশ্ববাসী জানে শাখারোভের ভাগে কী হোল! সোচ্চার হয়েছিলেন সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সোলঝ্নিৎসিন। আমরা সোলঝ্নিৎসিনের পরিণতিও জানি। এই অভিযোগ প্রায় সব কমিউনিস্ট দেশগুলিতেই অনুরণিত হচ্ছে। রাশিয়াতে লেনিনকে, স্ট্যালিনকে দায়ী করা যায় কিন্তু চীনে, যুগোশ্লাভিয়াতে, কিউবা কাম্পুচিয়াতে— সেখানে তো লেনিন স্ট্যালিনের উপস্থিত ছিল না। তাহলে দায়ী কে? গৃহীত হিংসাশ্রয়ী মার্কসীয় দর্শনই তার প্রয়োগকে সর্বগ্রাসী নিষ্করুণ স্বৈরতন্ত্রী বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। এবং তার ফলে যে Man Mankind-এর root তাইই uprooted হয়েছে, হচ্ছে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে রোমে ফরাসী ও ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনের ঘোষণা 'ইউরো-কমিউনিজমে'র উদ্ভব ঘটায়। ১৯৭৬ সালে পূর্ব বার্লিনে ২৯টি কমিউনিস্ট দেশের (পূর্ব ইউরোপের) যোগদানে ১৯৭৫-এর ঘোষণা ইস্তাহারের রূপ পায় যার আকর্ষণীয় দিকগুলি ছিল। (১) প্রত্যেক কমিউনিস্ট দলই সেই দেশের জাতীয় প্রয়োজন এবং অবস্থানুযায়ী মার্কাস ও লেনিনের শিক্ষা প্রয়োগ করবে। (২) সর্বহারার একনায়কত্ব

এবং এককেন্দ্রিক শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে, স্বীকার করা হয়েছে অবাধ ভোটাধিকার, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, দল গঠন ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ইত্যাদি। এশিয়াতে চীন চুপচাপ ছিল কিন্তু কার্যতঃ সে একই পথের পথিক হয়ে যাচ্ছে এবং বিস্ফোরণ ঘটালো পিপল্‌স ডেইলী (৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৪) পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে— বলা হলো মার্কস, লেনিন এবং এঙ্গেলেস এখন সেকেলে হয়ে গেছেন— আধুনিক যুগের প্রগতি ও প্রয়োজনের ধারণা মার্কস



# Die Krisis der Kommunistischen Internationale

Von Manabendra Nath Roy

I.

Das Problem der F... ...ung.

...rotz offiziellem Optimismus ist ... eine beklagenswerte, ...erlehme und beunruhigende Tatsache, daß der Einfluß der ...raktisch in jedem kapitalistischen Lande zurückgeht, — daß ...oletarischen Massen nicht für den Kommunismus gewonnen ...n. In den Augen der gegenwärtigen Führung bedeutet die ...ellung dieser Tatsache eine „rechte Abweichung", die einen ...einden Glauben an die Revolution enthüllt. Die einfache ...gung dieser Tatsache genügt, um als „Renegat" gebrand... zu werden. Trotzdem ist in allererster Linie eine gründ... Selbstprüfung unsererseits dringend notwendig, um die Ur... ...n dieses Stillstandes, ja mehr, dieses Rückganges in der Ent...ung der kommunistischen Parteien zu finden. Diese Ursachen ...n aufgezeigt und ausgerottet werden; das ist die grund...de Bedingung für den Erfolg der revolutionären proletari... Bewegung. Der Rückgang des Einflusses der kommunisti... Parteien in den kapitalistischen Ländern, ihre Unfähigkeit, ...ie Unterstützung der proletarischen Massen zu sichern, ...les ist um so mehr beklagenswert, unangenehm und be...igend, weil es vor sich geht nicht in einer Periode der Flau... sondern in einer Periode der allgemeinen (zwar langsamen, ...icheren) Radikalisierung der Arbeiterbewegung. Mit anderen ...n: gerade während die objektiven Bedingungen für den ...ph der Revolution heranreifen, versagt der subjektive Fak... ...dem er der Situation nicht gewachsen ist.

...innern wir uns der auffallendsten Tatsachen. In Deutsch... Vor 3 Jahren wurden auf die Initiative der KP. über 14 Mil... Arbeiter in der Frage der Fürstenentschädigung mobilisiert. ...n darauffolgenden Parlamentswahlen gelingt es der KP. ... die gleiche Stimmenzahl wie 1924 zu erreichen. In der ...rkreuzer-Kampagne, die den Parlamentswahlen folgt, kann ...rtei nicht die 1½ Millionen Stimmen aufbringen, die nötig ..., um einen Volksentscheid in dieser Frage zu verlangen. ...ither sehen wir einen andauernden Prozeß des Nieder...

ist wirklich erschütternd. Nach den Berichten auf dem 6. W... kongreß hatte die KP. damals 150 000 Mitglieder. Auf ... 10. Plenum berichtet Pjatnitzki, daß diese Zahl auf 81 432 he... gesunken sei; d. h. die Mitgliedschaft verminderte sich im L... eines Jahres beinahe um die Hälfte! Tatsächlich ist die Situa... noch viel schlechter; — in Wirklichkeit beträgt die Mitglieder... der Partei nicht mehr als 30 000. Wenn die Parteien unfähig ... ihre eigenen Mitglieder zu halten, um wieviel weniger kö... sie die Arbeiterklasse als Ganzes beeinflussen.

Der Verfall in China ist katastrophal. Die schwere Nie... lage 1927 hatte praktisch den Erfolg, daß die Partei als wirku... voller Faktor im politischen Leben des Landes ausgeschal... wurde. Die Ausmaße des Rückganges kamen klar zum Ausd... in dem gegenwärtigen Konflikt wegen der Mandschurischen Ei... bahn. Die KP., welche während der revolutionären Jahre 1925 bis 1927 die ganze Situation beherrschte, ist nicht fä... irgendeinen Massenwiderstand gegen die antirussischen Ha... lungen zu organisieren, welche die nationalistische Bourge... als direktes Instrument des Imperialismus begeht. Sicherlich ... das kein sehr rühmliches Zeugnis für eine Partei, die vor 2 Jah... noch die anerkannte Führerin von 2½ Millionen organisier... Arbeiter und beinahe 9 Millionen organisierter Bauern war! ... Partei und ihre roten Gewerkschaften haben ihren Einfluß ... die proletarischen Massen so vollständig verloren, daß die ... vorschlägt, daß die Kommunisten in Zukunft illegal in den re... mistischen Gewerkschaften arbeiten sollen, welche seit der Nie... lage der Revolution unter bürgerlich-gegenrevolutionärer Führ... eingesetzt wurden. Die ganze Klassenzusammensetzung der Pa... hat sich verändert. Während im Sommer 1927 über 60 Proz... der Mitglieder Arbeiter aus den großen industriellen Zent... waren, ist gegenwärtig das Verhältnis höchstens 1 Proz... (Tshu Chu-pao: „Internationale Pressekorrespondenz" Nr. ... 2. Juli 1929). Es ist beinahe unglaublich, doch wenn wir ... Quelle in Betracht ziehen, aus der diese Information stammt, ... ist anzunehmen, daß die Lage eher zu optimistisch eingesch... ist, als daß sie eine Unterschätzung darstellt.

*গেগেন ডেন স্টর্ম পত্রিকায় শ্রীরায়ের প্রবন্ধ 'কমিনটার্নে সংকট', ১৯২৯*

প্রমুখদের চিন্তাধারা গ্রহণ করতে পারে না। এবং আজকের চীনের কথা আমরা জানি। গত ১ জানুয়ারি বেজিং এর তিয়েন্‌মিন্‌ স্কোয়ারে মনুমেন্টের তলায় দশ হাজার ছাত্র ও বহু মানুষের বিশাল মিছিলের শ্লোগান ছিল 'স্বাধীনতা চাই, গণতন্ত্র চাই' 'গ্রেপ্তার করে কণ্ঠরোধ করা যায় না'...ইত্যাদি।

মানবেন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই পরিণতিকে উপলব্ধি করেছিলেন— "If Marx returned in our midst he would say that a hundred years ago he anticipated history to move according to a certain pattern but since that did not happen and things developed differently, what he said a hundred years ago does not hold good any longer and is to be rejected" [New orientation 1946 : M. N. Roy]. শোষণমুক্ত মানবসমাজ গঠনে মার্কস নির্দেশিত প্রয়াস শূন্যে বিলীন হলে 'মুক্তির' জন্য করণীয় কী হবে--- এই চিন্তাই নবমানবতাবাদী দর্শনের উদ্ভব ঘটিয়েছিল যার কেন্দ্রে ছিল দুটি অবলম্বন : (১) গ্রীক দার্শনিক প্রটেগোরাসের মানব মূল্যায়ণ— Man is the measure of every thing (২) সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের ঐতিহাসিক ভিখোর ইতিহাসের সংজ্ঞা— History is Humaity creating it self : আর তাঁর মনের গভীরে ছিল কিশোর কালের অনুসৃত বিবেকানন্দ নির্দেশিত 'মুক্তি'র বৈদান্তিক সংজ্ঞা। এই চেতনিক ও অবচেতনিক অবদানে সমৃদ্ধ হয়েই আত্মপ্রকাশ করলো নবমানবতাবাদের ২২টি সূত্র। এইসব সূত্রগুলির অন্যতম কয়েকটি হলো : (১) মানুষই সমাজের আদর্শ। সমবায় মূলক সামাজিক সম্পর্কগুলি ব্যক্তিগত সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশে অবদান যোগায়। কিন্তু সামাজিক উন্নতির মাপক হলো ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি। সমষ্টির ধর্ম ব্যষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করেই।

(২) মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যর সন্ধান মানব প্রগতির মূল প্রেরণা। জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বুদ্ধি বৃত্তি ও আবেগের উচ্চস্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমপর্যবেশিত হয়েছে। সত্যের অনুসন্ধান এরই অনুসিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর উৎপীড়ন থেকে এবং ভৌত সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে নিজেকে ক্রমশঃ মুক্ত করতে মানুষকে সাহায্য করেছে প্রকৃতি সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান। সত্য হচ্ছে জ্ঞানের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু।

(৩) ব্যষ্টিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষের যুক্তিসংগত প্রচেষ্টা হলো আরও-বেশী পরিমাণে মুক্তি অর্জন করা। যন্ত্রায়িত সামাজিক সংস্থার চাকার দাঁত হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি উপ্ত করার বাধা সমূহের ক্রমাপসরণই হলো মুক্তি।

(৪) মৌলবাদ (Radicalism) একটি অনুশাসন-বাক্য থেকে সূচিত হয় 'মানুষই সবকিছুর পরিমাপ (প্রোটেগোরাস) অথবা মানুষ মনুষ্যজাতির মূল (মার্কস) এবং আত্মিকভাবে মুক্ত নৈতিক মানুষের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা মুক্ত মানুষের সাধারণ সম্পদ সৌভ্রাতৃমূলক ক্ষেত্র হিসেবে জগতের পুনর্গঠনের কথা পেশ করে। বিংশ শতাব্দীর ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিসংখ্যানতত্ত্ব যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। তফাৎ শুধু এইখানে। বিজ্ঞানের ওই তত্ত্বদুটির গুরুত্ব উপলব্ধ ও ব্যবহৃত সত্য আর মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদের গুরুত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ্য, ক্রমশঃ উপলব্ধ একটি অভ্রান্ত সত্য। সমস্যায় কণ্টকিত, জটিলতার সর্পিল পথে আবর্তিত সমাজ জীবন বিশ্বজুড়ে ওই সত্যের দিকেই কোথাও স্বচ্ছন্দ গতিতে কোথাও প্রতিকূলতার বাধা ঠেলে ধাবিত হচ্ছে শোষণমুক্ত কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ক্ষমতার ক্রীতদাসত্ববন্ধন মুক্ত হয়ে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মানুষ এই নবমানবতার আদর্শের রূপায়ণের কতটা অংশগ্রহণ করবে তার উপর আমাদের দ্বিতীয় নবজাগরণ যা অসম্পূর্ণ রেনেসাঁসের পূর্ণতা প্রাপ্তি নির্ভর করছে।

***(মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত)***

# মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনের ঘটনাক্রমিক সংক্ষেপিত কালপঞ্জী

১৮৮৭ মার্চ ২১ : উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আড়বেলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য (রায়) নিজ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ক্ষেপুত ছেড়ে এসে আড়বেলিয়া গ্রামের স্কুলে হেড পণ্ডিতের কাজ করতেন। নাম রাখা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

১৮৯৭— নরেন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় তাঁর মাতুলালয়ে কোদালিয়াতে।

১৯০৫— পিতার মৃত্যু হয়। ওই সময়ই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বক্তৃতা দিতে আসা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা আয়োজন করেন এবং সেই অপরাধে স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। এক আত্মীয়ের মাধ্যমে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯০৬-১৯০৮— বেঙ্গল ন্যাশান্যাল কলেজ (যার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ) থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভর্তি হন তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ (যাদবপুর)। এই সময়ে চাংড়িপোতায় নিজস্ব এক বিপ্লবী সংস্থা গড়ে তোলেন। চাংড়িপোতা রেলস্টেশনে তাঁর নেতৃত্বে বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি হয় বিপ্লবী সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়েন কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পান।

১৯১৫ এপ্রিল— প্রতিশ্রুত জার্মান-অস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা রূপদানের জন্য নরেন্দ্রনাথের বাটাভিয়া যাত্রা চার্লস এ. মার্টিন ছদ্মনামে। জুনে ভারতে ফেরা— কিন্তু পরিকল্পনা মতো অস্ত্র পাওয়ার ব্যর্থতা।

১৯১৬-জুন— স্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জির ভাই ধনগোপালের আতিথ্য গ্রহণ--- বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আলফা-বিটা -স্কলারশিপ প্রাপ্ত এভলিন ট্রেন্ট-এর সঙ্গে আলাপ। আমেরিকান সংবাদপত্রের ঘোষণা ''বিপ্লবী হিন্দু ব্রাহ্মণ বা বিপজ্জনক জার্মান স্পাই-এর আগমন!''

গ্রেপ্তার এড়াতে ওই বিশ্ববিদ্যালয়- প্রাঙ্গণে নরেন্দ্রনাথের নাম পরিবর্তন— মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায়।

১৯১৬ অক্টোবর— নিউইয়র্ক গমন— লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অন্যান্য বিশিষ্ট আমেরিকান র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে আলাপ— লালা লাজপত রায়ের কাছ থেকে পাওয়া গ্রন্থ 'Capital' অধ্যয়ন— ওই গ্রন্থ এবং পরিস্থিতির

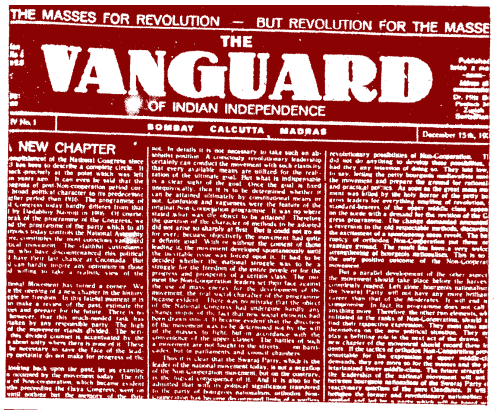
THE MASSES FOR REVOLUTION — BUT REVOLUTION FOR THE MASSE

THE VANGUARD OF INDIAN INDEPENDENCE

BOMBAY CALCUTTA MADRAS

NEW CHAPTER

*বার্লিন থেকে প্রকাশিত মানবেন্দ্রের পাক্ষিক পত্র 'দি ভ্যানগার্ড, ১৯২৩*

মূল্যায়ন তাঁকে মার্ক্সিস্ট হয়ে ওঠায় উদ্বুদ্ধ করে। এভলিন ট্রেন্টকে বিবাহ।

১৯১৭ আগস্ট--- মেক্সিকোয় সাদর অভ্যর্থনা এবং মেক্সিকান সোস্যালিস্ট পার্টির রায়কে আমন্ত্রণ।

১৯১৭ নভেম্বর— বলশেভিকদের দ্বারা লেনিনের নেতৃত্ব রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল।

১৯১৭-১৮— রায় কর্তৃক স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হয় ''Elcamino para la paz duradera del mundo (স্থায়ী বিশ্বশান্তির পথ)। রায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা ১৯৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকা La India Supasado Su presentey Su Parvanir [India--Her past present and Future]'

১৯১৮ ডিসেম্বর— সোস্যালিস্ট পার্টি অফ মেক্সিকোর অধিবেশন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এন রায়ের নির্বাচন।

১৯১৯, ১৫ জানুয়ারি— রাশিয়ার তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিনটার্ন)-এর প্রতিষ্ঠা।

১৯১৯ অক্টোবর-নভেম্বর— এম এন রায় কর্তৃক রাশিয়ার বাইরে রাশিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকেই মেক্সিকোতে প্রথম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। লেনিন কর্তৃক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায়কে মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রণ।

১৯২০ জানুয়ারি-এপ্রিল— বার্লিনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয় রায়ের, চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানও হয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম : থ্যালহাইমার, ব্র্যান্ডলার সহ জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্টরা, পুরানো অনেকেই ছিলেন আবার, যেমন বার্নস্টাইন, কার্ডটস্কি; হল্যান্ড কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা— কমিনটার্নের কার্ল রাডেক এবং বার্লিনের ভারতীয় রিভোলিউশনারী কমিটির ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ।

১৯২০ এপ্রিল-মে— মস্কো পৌঁছলেন রায়। ১ মে প্রথম মস্কোর রেড স্কোয়ারে রায়ের বক্তৃতা।

১৯২০ মে--- লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১৯২০ জুলাই ১৯--- আগস্ট ৭--- কমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধন হলো বোদ্রোনাডে স্মেলনি হলে। এইখানে লেনিনের উপনিবেশ সংক্রান্ত বক্তব্যর বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি দেন এম এন রায়। দীর্ঘ বিতর্কের পর রায়-লেনিন যুগ্ম থিসিস গৃহীত হয়। এই কংগ্রেসে রায়ের সঙ্গে আলাপ হয় বুখারিন, গোর্কি, লুকাস জন বিড প্রমুখদের সঙ্গে।

১৯২০ আগস্ট-অক্টোবর— লেনিনের নির্দেশে রায় পোলিশ ফ্রন্টে যান এবং স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও ট্রটস্কির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়।

মস্কোতে গঠিত 'All India Central Revolutionary Committee'র চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন রায়।

১৯২১ আগস্ট-সেপ্টেম্বর— ভারতে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনের জন্য ইস্তাহার তৈরি করে বিপ্লবী নলিনী গুপ্তের মাধ্যমে রায় তা ভারতে পাঠালেন। গুপ্ত ভারতে দেখা করেন মুজফফর

আহ্‌মেদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখদের সঙ্গে। কলকাতায় দেশবন্ধু আগেই গ্রেপ্তার হন। হজরৎ মোহাজীর মারফৎ পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এলে কংগ্রেস তা অগ্রাহ্য করে।

১৯২১ ডিসেম্বর---কমিনটার্নের বহুভাষী-জার্নাল Communist International No. 3 and Inprecor-এ রায়ের ভারত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯২২--- রায় লিখিত 'India in transition' গ্রন্থটি রাশিয়ান সংস্করণ মস্কো থেকে, ইংরাজী সংস্করণ বার্লিন থেকে এবং পরে জার্মান সংস্করণ হ্যামবুর্গ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২২, ১৫ মে— বার্লিন থেকে পাক্ষিক 'The Vanguard of Indian Independence' প্রকাশিত হতে থাকে। (চিত্র)

১৯২২, ১ অক্টোবর— পত্রিকাটি 'The Advance Quard' এ রূপান্তরিত হয়।

১৯২২ অক্টোবর-নভেম্বর— রায় তাঁর পত্রপত্রিকা এবং প্রেরিত লোকজনের মাধ্যমে সারা ভারতে ছোট ছোট কমিউনিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করেন।

১৯২২ নভেম্বর ৫---ডিসেম্বর ৫--- কমিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেসে কমিনটার্নের এক্সিকিউটিভ বডি ECCI-র জন্য লেনিন, ট্রটস্কি-র সঙ্গে রায় নির্বাচিত হন। রায় নির্দেশ দিলেন ভারতের জন্য একটি গুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠন করতে আর প্রকাশ্যভাবে 'বৈপ্লবিক গণপার্টি' গঠন করতে যাতে করে কংগ্রেসের মধ্যস্থ বামপন্থীদেরকে টেনে আনা যায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যায়।

১৯২৩ জানুয়ারী— রায় দেশবন্ধুকে চিঠি দিলেন এবং এভলিন ট্রেন্ট ও তিনি বার্লিন থেকে 'One year of non-cooperation from Ahemadabad to Goa Gaya' হ্যান্ডবিল কলকাতার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন এবং তা অবশিষ্ট ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে।

১৯২৫ জানুয়ারি— রায় কর্তৃক প্যারিস থেকে একটি মাসিক পত্রিকা 'Masses of India'র প্রকাশ। রায় ফ্রান্স থেকে বহিষ্কৃত হন।

১৯২৫ অক্টোবর--- রায়ের ভারতে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা স্ট্যালিন কর্তৃক বাতিল।

১৯২৬ জুন-জুলাই— রায়ের গ্রন্থ 'The Future of Indian Politics" লন্ডন থেকে ইংরাজীতে, মস্কো থেকে রাশিয়ান এবং হ্যামদুর্গ থেকে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হলো।

১৯২৬ নভেম্বর-ডিসেম্বর : কমিনটার্নের সপ্তম প্লেনাম— রায় পুনর্নির্বাচিত। চাইনিজ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত। চীনা কুয়েদমন্টাং নীতি নিয়ে তীব্র বিতর্ক। চীনে কৃষি বিপ্লবের জন্য রায়ের পরামর্শ। রায়কে কমিনটার্ন ডেলিগেশনের নেতারূপে চীনে পাঠানোর প্রস্তাব।

১৯২৭ এপ্রিল ১৮- মে ৩০ : চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের উদ্দেশে রায়ের ভাষণ। কৃষিবিপ্লবের প্রস্তুতির মাধ্যমে ভিত্ তৈরি এবং উত্তরে সামরিক অভিযান না করার পরামর্শ— বোরাদিন এবং চীনা নেতা চেন-তু-সু-র বিরোধিতা, এম এন রায়ের প্রস্তাব যাতে কার্যকর না হয় পলিটব্যুরোর সভায় মাও-সে-তুং-এর তীব্র বিরোধিতা করা এবং রায়কে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলেই মত প্রকাশ করেন তিনি। অথচ রায়ের পথই যে পথ তা স্টালিন চীনের পরিস্থিতি সম্যক জেনেও চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে টেলিগ্রাম করে জানান। এই টেলিগ্রাম নিয়ে পরে খুব জলঘোলা করা হয়। যাই হোক চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও বোরাদিন যে পক্ষ নিয়েছিলেন তাতে চিয়াং কাইশেক ও কুয়োমিটাং-এর বামপন্থীরা নির্মমভাবে কমিউনিস্টদের দমন করে এবং চীনা মিশন ব্যর্থ হয়— রায় মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি পেরিয়ে সোভিয়েট সহযোগিতায় মস্কো ফিরে আসেন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি ৯-২৫--- মস্কোতে ECCI-এর নবম প্লেনাম— স্ট্যালিন সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে উগ্রচরমপন্থার পথ অবলম্বন করেন— রায় প্রেসিডিয়াম পুনর্নির্বাচিত হলেও কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে যান অসুস্থতার জন্য, রায় স্ট্যালিনের উগ্রপন্থা পছন্দ করছিলেন না। কার্যতঃ রায় মস্কোতে অন্তরীণ হলেন।

১৯২৮ এপ্রিল— রায়কে তার মস্কো এবং বার্লিনের শুভানুধ্যায়ীরা ব্যবস্থা করে গোপনে বার্লিনে নিয়ে আসেন। ১৯২৮ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর— বার্লিনে রায় এলেন।

১৯৩০-১১ ডিসেম্বর--- রায় করাচি পৌঁছলেন স্থলপথে ইস্তাম্বুল- বাগদাদ হয়ে 'ব্যানার্জী'-র নামে পাশপোর্ট নিয়ে এলেন বোম্বাইতে যখন তাঁর নাম হয়েছিল ডাঃ মাহমুদ।

১৯৩০-২১ জুলাই— রায় গ্রেপ্তার হলেন। তার আগে 'Independent India' প্রকাশক ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন— কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুণা, বরোদা, বেনারস ইত্যাদি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে। করাচি কংগ্রেসে নেহরু উপস্থাপিত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের খসড়া প্রকৃতপক্ষে তাঁরই রচনা।

জেলের মধ্যেই রায়ের বিচার হলো— ১২ বছরের কারাদণ্ড।

১৯৩৩-২৭ মে— আপীলে মেয়াদ কমে হলো ছয় বছর।

১৯৩৬ নভেম্বর ২০--- রায় কারারুদ্ধ হলেন। এ আই সি সি-র সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেন।

১৯৩৭-৩৮— ব্যাপকভাবে সারা ভারত ঘুরলেন, বক্তব্য রাখলেন, জাতীয় কংগ্রেসে নতুন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রয়োজনের কথা বললেন— অনেকগুলি যুবসম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন।

১৯৩৯, ১ মে— লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস মেন গঠিত হলো। রায়ের সভাপতিত্বে পুণার এর প্রথম সম্মেলন হয় (জুন ২৭-২৮)।

১৯৪০ মার্চ— রায় কংগ্রেস সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে যান।

১৯৪০ ডিসেম্বর--- কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ এবং নতুন পার্টি Radical Democratic Party গঠন।

১৯৪১ নভেম্বর— লাহোরে রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে লাহোরে 'Indian Federation of Labour' স্থাপিত হলো।

১৯৪২ আগস্ট ৯— ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হলো।

১৯৪৩ সেপ্টেম্বর--- র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির হেড কোয়ার্টার ও Independent India দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো।

১৯৪৪ সেপ্টেম্বর— গান্ধী-জিন্না আলোচনা 'পাকিস্তান সৃষ্টির' প্রসঙ্গে ভেঙ্গে যায়। রায় একটা ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এবং স্বাধীন ভারতের জন্য একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করেন।

১৯৪৬ আগস্ট— Indian Renaissance Institute-র প্রতিষ্ঠা হলো দেরাদুনে, রায় প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর।

১৯৪৬ ডিসেম্বর--- আর ডি পি-র অধিবেশন বোম্বাইতে গৃহীত হলো র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাসি বা মৌল গণতন্ত্রের জন্য ২২টি নীতি।

১৯৪৭ মে--- দেরাদুন ক্যাম্পে New Humanism-র খসড়া ইস্তাহার রায় কর্তৃক।

১৯৪৭ আগস্ট--- উপস্থাপন, ভারত বিভাজন-ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব।

১৯৪৮, ডিসেম্বর— কলকাতা অধিবেশনে আর ডি পি ভেঙ্গে দিয়ে Radical Humanist Movement বিকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ১৯৫২-১১ জুন— মুসৌরির দুর্ঘটনা— খাদে পড়ে যাওয়া। ১৯৫৪, ২৫ জানুয়ারি— এম এন রায়ের মৃত্যু।

*(সঙ্কলক : দেবীপ্রসাদ রায়)*

## ধর্ষণ ভাতা

নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতার সহিত সংবাদপত্র প্রকাশ করা হলে প্রত্যেক শাসকের যে গোঁসা হয় তা আবারও প্রমাণিত হলো। এর আগে এক সংবাদপত্রের সাংবাদিক মিসায় আটক হয়েছিলেন, আর এক সরকারের ক্যাপটেন বলেছিলেন, আমার কাছে আসবেন ভালো সাংবাদিক বানিয়ে দেব [বসু, (১৭.৮.৯৫)]। এখন পরিবর্তনের সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেই সেই সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা ও কণ্ঠরোধ করা শুরু হয়ে যাচ্ছে। স্কুল কলেজে ও লাইব্রেরীতে সেইসব সংবাদপত্রের ওইসব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ নিষেধ ঘটেছে। যেসব সংবাদপত্র তাঁর কোপে পড়েছে তাদের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আবার বলেছেন, সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের কাউন্সেলিং দরকার (৬.৯.১২)।

কারণ রাজ্যে ডেঙ্গু হচ্ছে তা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যাবে না। তাহলে সেটা হবে অপপ্রচার! তাতে স্বাস্থ্যবিভাগের অপদার্থতা লজ্জাজনকভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে ও পড়ছেও। তাই এত হুঙ্কার। আমরা জানতাম উনি ব্যারিস্টারি পড়েছেন। কিন্তু তিনি যে ডাক্তারীও গোপনে পড়েছেন সেটা জানা গেল। ডেঙ্গু হলে কি খেতে হবে খাবার হিসাবে, কি পাস করতে হবে চিকিৎসকদের সে বিষয়ে নির্দেশিকাও দিচ্ছেন। যাই হোক, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জানা নেই এমন কোনও কাজই নেই। উনি গদিতে বসার পর থেকে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেনের' মতো দু'হাতে যাবতীয় প্রকল্পের ঘোষণা করে চলেছেন। আর এখন থেকে সামনের নির্বাচনে জেতার জন্য এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অর্থ অপচয় করে যাচ্ছেন।

আমাদের রাজ্যে অনেক প্রকার 'ভাতা' চালু আছে। সবরকম ভাতা ঠিক ঠিক ভাবে সকলে পান কি না তাঁরাই জানেন। যাই হোক, সেইসব ভাতা যথা— (১) বিধবা ভাতা, (২) বার্ধক্য ভাতা, (৩) স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা, (৪) বেকার ভাতা, (৫) ইমাম ভাতা, (৬) মোয়াজ্জিম ভাতা। একটি ভালো ভাতার ব্যবস্থা যেমন করেছেন যথা— (৭) ক্যান্সার ভাতা, তেমনি একটি হাস্যকর ভাতার কথা ঘোষণা করেছেন, সেই ভাতাটির নাম (৮) ধর্ষণ ভাতা। এই ধর্ষণ ভাতা সম্পর্কে বলা যায়, এটা প্রমাণিত হলে নাবালিকার ক্ষেত্রে ৩০ হাজার আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা।

ঘটনা হলো, একটি মহিলা তা সে নাবালিকাই হোক বা সাবালিকা, তিনি যোগসাজস করে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করার পর ঘুষখোর ডাক্তার ও পুলিশকে দিয়ে প্রমাণ করালো সে ধর্ষিতা হয়েছে। সরকার তাকে বয়স অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিল। সে ডাক্তারকে ও পুলিশকে কথামতো পার্সেন্টেজ দিয়ে দিল। অর্থাৎ পুলিশের আর ডাক্তারের অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থাও হলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্ষিতাকে ২০/৩০ হাজার দেওয়া হলো। হাজার টাকা দিলেই তার সতীত্বটা কি ফিরিয়ে দিতে পারবেন শাসকদের কেউ? পারবেন না। ধর্ষিতার মুখ বন্ধ করার জন্য ভাতা দেবেন কিন্তু ধর্ষকের কোনও শাস্তির কথা বলেননি। ধর্ষককে ধরে যদি প্রমাণিত হবার পর লিঙ্গচ্ছেদ করা হয়, ধর্ষণ যে বহুল পরিমাণে কমে যাবে তা হলফ করে বলা যায়।

**—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।**

## সাজানো ঘটনা

'সাজানো ঘটনা'— পার্ক স্ট্রীটের ধর্ষণকাণ্ড সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ধরনের একটি মন্তব্য করেছিলেন। তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন অবশ্য বলেছিলেন 'ঘটনা' একটা ঘটেছে। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি প্রমাণ করলেন তিনি যা বলেছিলেন সেটাই ঠিক। পরে তিনি তাঁর কাজের জন্য উপযুক্তভাবে 'পুরস্কৃত' হলেন। নির্বাসন। অবশ্য সরকারিভাবে ঘোষিত হলো এটা রুটিনমাফিক বদলি। পুলিশে সঙ্কেত চলে গেল। সবাই বুঝে গেল এখন থেকে কী করতে হবে। এরপর থেকে সাম্প্রতিক চেতলা, গল্ফগ্রীন, বারাসাত, লেডিজ পার্ক যেখানেই যত ঘটনা ঘটুক না কেন সবই 'সাজানো ঘটনা'। ধর্ষিতারা থানায় যে অভিযোগই করে থাকুন না কেন পরবর্তীকালে অভিযোগকারিণীরা সেসব প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফলে বয়ান বা জবানবন্দী পাল্টে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সংবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। সংবাদপাঠকরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক।

একজন মহিলা সে বার ড্যান্সারই হোন বা পরিচারিকা, আদিবাসী রমণী বা দেহ পসারিণী, কেউই থানায় গিয়ে প্রকাশ্যে সকলের সামনে নিজের লাঞ্ছনা বা অত্যাচারের ঘটনা নিজমুখে বলতে পারেন না যদি না তিনি সত্যিই অত্যাচারিতা বা লাঞ্ছিতা না হয়ে থাকেন। অনেকে আবার পার্ক স্ট্রীটের ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন মধ্যরাতে যে মদ্যপ যুবককের গাড়িতে 'লিফট্' নেয় তার স্বভাব চরিত্র অবশ্যই ভাল নয়।

অর্থাৎ স্বভাব চরিত্র ভাল না হলেই যে কোনও মহিলাকে বলপূর্বক ধর্ষণ করা যেতে পারে! অকাট্য যুক্তি। তারিফ করার মতো। সম্ভবতঃ সে কারণেই রাজ্যে ধর্ষণের ঘটনা এত বেড়ে গেছে। ইভটিজিং শ্লীলতাহানি বা ধর্ষণের ঘটনা এখন প্রাত্যহিক সংবাদ। প্রায়দিনই সংবাদপত্রে এক বা একাধিক ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। তবে এ সব নিয়ে কোন মন্তব্য করতে হলে অবশ্যই সাবধানে সবদিক ভেবেচিন্তে করতে হবে। কারণ সরকার বিরোধী মন্তব্য হলে 'মাওবাদী' তক্মা দিয়ে জামিন-অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করলে সব জারিজুরি খতম্ হয়ে যাবে।

বামফ্রন্টের আমলে যে ধর্ষণকাণ্ড ঘটেনি, তা নয়। একটি তথ্যে প্রকাশ ১৯৮৭ থেকে ২০০৭, ২০ বছরে নথিভুক্ত ধর্ষণের সংখ্যা ১৪,৪০০। আর বানতলা, ধানতলা, ঘোকসাডাঙ্গা, গোয়ালতোড় প্রভৃতির ঘটনা তো সর্বজনবিদিত। বামফ্রন্টের আমলে ধর্ষণের বহু ঘটনাই নথিভুক্ত হোত না। তবে বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষণের ঘটনা ঘটলেই মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে 'সাজানো ঘটনা' বলে যে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন আর পুলিশের কাছে সঙ্কেত পৌঁছে যাচ্ছে আশু কর্তব্য কি, সম্ভবতঃ তেমনটি ঘটত না।

**—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর-৭১২১৩৬।**

# ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে

**তারক সাহা**

গত লোকসভা অধিবেশনে সরকার কালো টাকা নিয়ে শ্বেতপত্র পেশ করে সংসদে। আর এর ফলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নজরে আসে। এর বিপক্ষে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিরোধীদের বক্তব্য হলো— দেশের কালো টাকা এবং বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকা নিয়ে সরকারকে দু'রকম নীতি গ্রহণ করতে হবে। ঘরোয়া কালোটাকার কিয়দংশ বিভিন্নভাবে যথা রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ শিল্প, মাইনিং সেক্টর, পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বিদেশে গচ্ছিত কালোটাকার ঘরোয়া জি ডি পি বৃদ্ধিতে কাজে আসে না। বিদেশের কালোটাকা এদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফ ডি আই) প্রকল্পের মাধ্যমে এদেশের শেয়ার বাজারে লগ্নীর কাজে লাগানো যেতে পারে।

ঘরোয়া কালোটাকার সৃষ্টি সরকারের ওপর মানুষের অনাস্থার প্রতীক। অন্যদিকে বিদেশে গচ্ছিত কালোটাকা প্রকৃতপক্ষে দেশের তথা দেশের মানুষের প্রতি সঞ্চয়কারীর একপ্রকার অনাস্থা প্রকাশের সামিল। ঘরোয়া কালোটাকা মূলতঃ নগদ লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল এবং সাধারণ মানুষ সরকারের আয়কর কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে ব্যাঙ্ক বা অন্য মূলধনী সংস্থাগুলিতে লগ্নি করতে ভীত হয়ে নিজের হেফাজতে সঞ্চয় করে। সুতরাং কালোটাকা মূলতঃ সঞ্চয় হয় নগদে বা ওইসব লেনদেন হয় নগদেই। তাই এইসব সঞ্চয় উচ্চমূল্যের নোটে রাখা অনেক সুবিধাজনক। ছোটমূল্যের নোটে তা নিজের কাছে রাখার জন্যে অনেক বেশী স্থানের প্রয়োজন।

ভারতে যে কারেন্সী নোট বাজারে চালু রয়েছে তার ব্যাপ্তি হলো ১ টাকা থেকে এক হাজার টাকা। অর্থাৎ আমাদের দেশে এই পার্থক্য সর্বনিম্ন কারেন্সির তুলনায় সর্বোচ্চ নোটের ব্যাপ্তি ১০০০ গুণ। আর মার্কিনমূলক তা ১০০ গুণ। অথাৎ সে দেশে মুদ্রা বাজারে চালু নোট ১ ডলার থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত। অথচ আমাদের দেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক উচ্চতর মূল্যের নোট ছাপাতে বেশী ব্যাকুল। অথচ দেশের সাধারণ গরীব মানুষরা ছোট মুদ্রাই বেশী ব্যবহার করে। ২০০৫-০৬ সালে দেশে ৪৩ লাখ কোটি মুদ্রা এবং নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে ছাড়ে যার সাতান্ন শতাংশই ৫০০ ও হাজার টাকার নোট। ২০১০-১১ সালেই এটা বেড়ে দাঁড়ায় ঊনআশি শতাংশ। ওই সময়ে দেশে মোট ৯৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের নোট ছাড়া হয় দেশে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সরকারের নজর হলো উচ্চমূল্যের নোট বেশী পরিমাণে বাজারে ছাড়া। অথচ ছোটমূল্য নোটের চাহিদা দেশে সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ বেশি মূল্যের নোট ছাপিয়ে সরকার কালো টাকা সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

কালো টাকা সৃষ্টিতে যদি সরকার রাশ টানতে চায় তবে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নিক। বদলে বেশি সংখ্যায় চালু করুক ৫০ ও ১০০ টাকার নোট। সমস্ত বড় টাকার নোট সর্বাধিক ৬ মাস সময়কালে তুলে নিক জনগণের কাছ থেকে। এতে অবশ্য পর্যাপ্ত ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার নোট বাজারে চালু করা উচিত।

যদি এমনটা সত্যিই ঘটে তবে সরকারের উচিত যারা এর আগে তাদের আয় বা আয়ের উৎস সরকারকে জানায়নি তাদের জন্য শাস্তি কী হবে তা নির্ধারণ করা। উদাহরণ হিসেবে ধরে নেওয়া যায় যে, ২০১০-১১ অর্থবর্ষে এরকম ৫০০ ও হাজার টাকার নোট সরকারের কোষাগারে জমা পড়ল ৭৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং এই বাতিল টাকার অর্থমূল্য ৫০-১০০ টাকার নোটে রূপান্তর করা গেল আর তা থেকে সরকার জানতে পারবে সঠিকভাবে যে কত টাকা কালো টাকা হিসেবে দেশে চালু রয়েছে। অবশ্য এসবের জন্য দেশে পর্যাপ্ত ৫০-১০০ টাকার নোট চালু থাকা দরকার।

আরেকটা ইস্যু সরকারের মাথায় রাখা দরকার। তা হলো— কালো টাকার তথ্য বলছে যে, কালোটাকার আইনি কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। যথেচ্ছ পরিমাণ কালোটাকা নিজের কাছে মজুত রাখা এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে তা স্থানান্তরিত করা যায়। এর জন্য কারুর কাছে জবাবদিহি করা বাধ্যতামূলক নয়। সরকারের কাছে সুপারিশ রয়েছে যে, সরকার বর্তমানে চালু কয়েনেজ অ্যাক্ট ২০১১, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ১৯৩৪, ফেমাসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা সংশোধন করে কিংবা নতুন কোনও আইন চালু করে কালো টাকা মজুত ও তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করুক সরকার। এই বন্দোবস্ত নিশ্চিতভাবে নিজস্ব খরচপাতি ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ নিজের কাছে রাখা নিয়ন্ত্রণ করবে। অতিরিক্ত টাকা নিজের কাছে রাখলে সরকারের হাতে তা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকবে। অবশ্য এই আইন চালু করতে সংসদে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে ঐক্যমত্য হতে হবে।

আমাদের জানা আছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি নগদ অর্থ বিপুল পরিমাণে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে হস্তান্তরিত হয়। উদাহরণ হিসেবে সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে সমাপ্ত হওয়া নির্বাচনকে তুলে ধরা যায়। এই নির্বাচনের ঠিক আগে ৩২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনা বিশাল হিমবাহে এক টুকরো বরফের মতো। এই অর্থ ভোটারদের মধ্যে বিলি করা হোত বলে খবর।

আমেরিকার মতো উন্নতদেশে নিজের কাছে টাকা রাখা বা তার নগদ ব্যবহারের ওপর প্রতিবন্ধকতা নেই, যদি না সেই অর্থ মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকে। তবুও ১০ হাজার ডলারের ওপর খরচ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সেবাকে জানাতে হয়। অবশ্যই সেখানে দেশের বাইরে বা অভ্যন্তরে যাতায়াতের ওপর ডলার ব্যয়ের একটা নিয়ন্ত্রণ চালু আছে। দেশটা যেহেতু উন্নত তাই অধিকাংশ খরচা ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড সহ ব্যাঙ্কিং চ্যানেলে হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে ঠিক উল্টোটা হয়। কর ফাঁকি দিতে আর কালোটাকা কমাতে অধিকতর সময়ে নগদে লেন-দেন হয়ে থাকে। অধিকমূল্যে নোটের মাধ্যমে তা আরও সহজতর ও ব্যাপক হয়ে থাকে। এইসব বিষয়গুলি মাথায় রেখে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নগদে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান অবশ্যই কালোটাকা নিয়ন্ত্রণে ও তা স্থানান্তরিত করার বিষয়ে অনেকটাই সাহায্য করবে।

দুটি উপায়— মূলতঃ ৫০০ ও হাজার টাকার নোট বাতিল এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নগদ ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ অভ্যন্তরে কালোটাকার ওপর লাগাম পরাতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। সম্পূর্ণভাবে কালোটাকা সৃষ্টি করা হয়তো যাবে না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। মানুষের মধ্যে সততা আজ খাদের কিনারে এসেছে। আমাদের দেশের সাংসদ বা অন্যান্য চিন্তাবিদদের এসব বিষয়ের ওপর চিন্তা করায় অবকাশ আছে কি? সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। □

# লৌকিক দেবতা



**নবকুমার ভট্টাচার্য**

পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত ডোমকুলি গ্রামের উত্তরে মারাংবুরুর থান। পলাশ, করম, ভেঁটরা, মাদাল, ইন্দ্রযব ও বাবলা গাছের জঙ্গলে ঘেরা অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে একটি করম গাছের নীচে মারাংবুরুর অবস্থান। সে অর্থে মারাংবুরুর কোনও মন্দির নেই। মারাংবুরুর অর্থ বড় পাহাড়। তাই মারাংবুরুর কোনও নির্দিষ্ট মূর্তিও নেই। একটা করমগাছে একটা কড়া ও হাতা তার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত রয়েছে। পুজোর থানে স্তূপীকৃত মাটির হাতি। ঘোড়া, ঘট, খুরি ও প্রদীপ রয়েছে।

উল্লেখ্য বাগমুন্ডির পার্শ্ববর্তী গ্রাম চড়িদা। সেখানেও একটা বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে মারাংবুরু রূপে পুজো করা হয়। স্থানীয়দের বিশ্বাস বর্তমান রাজা (অর্থাৎ রাজত্বহীন তবুও রাজা বলে ইনি সম্মানিত) নিয়ে ছয় পুরুষ ধরে এই মারাংবুরু পুজো পেয়ে আসছেন। এই দেবতা প্রতি শনিবারে পুজো পেয়ে থাকেন, নিদেন পক্ষে ফুল ও জল সহযোগে। শ্রাবণ মাসের যে কোনও শনিবার বিশেষ ধরনের হাতি ও ঘোড়া সহযোগে পুজো হয়। এছাড়া বন্ধ্যানারী সন্তান কামনায় এই থানে মানসিক পুজো দিয়ে থাকেন। কিন্তু কোনও মল মাসে পুজো হয় না। তখন পুজো বন্ধ থাকে। তবে এই পুজোর ইতিহাস তিনশো বছরের অধিক বলে মনে হয় না। আদিম কৌম জীবনের সঙ্গে এই পুজোর বেশ যোগ রয়েছে— দেবতার আকৃতিতে ও তার পুজো প্রকরণে। বৃক্ষপুজো ও প্রস্তরপুজো এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত অলৌকিক বিশ্বাস যে প্রাচীন ধারণা— গবেষণার মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

*শিল্পীর তুলিতে : সন্তান কামনায় জনজাতি রমণ-রমণীর মারাংবুরুর থানে মানসিক পুজো।*

পুজো করেন নায়া পদবিধারী ভূমিজ ও মুণ্ডাদের মধ্যে উচ্চতর শ্রেণীর লোক। পূজারীরা মনে করেন মারাংবুরুর সেবা করা তাঁদের কর্তব্য। এই পুজো না করলে গ্রামের অমঙ্গল হবে। আগে বাগমুণ্ডির তদানীন্তন রাজা কর্তৃক প্রদত্ত জমির আয় থেকে পুজোর খরচ-খরচা চলত। বর্তমানে সে আয় বন্ধ।

আগে পুজোয় পাঁঠা বা মহিষ শাবক বলি দেওয়া হোত। এখন আর্থিক অভাবের জন্য কখনও কখনও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। পূজক দক্ষিণপূর্ব কোণে মুখ করে বসে পুজো করেন। পুজোর মন্ত্র সংস্কৃত নয়, স্থানীয় ভাষায় পুজো হয়। পুজোর থানে কোনও উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণের আগমন নিষিদ্ধ।

১৯৬৫ সালে রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহদেবের মৃত্যুর পর থেকে পুজোর জাঁকজমক কিছুটা কমেছে। □

Ori Plast

**P.V.C. Threaded Pipes.** For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

***Authrorised Distributor :***

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

# ঐতিহাসিক দুর্গ চিতোরগড়

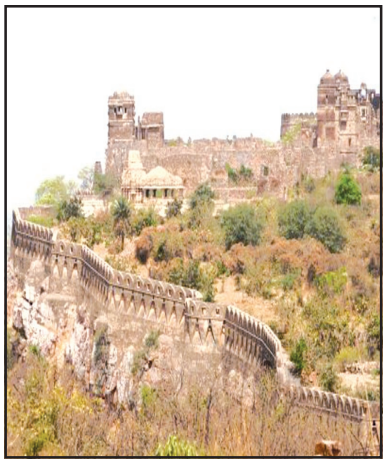

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের অন্যতম সর্ববৃহৎ এবং রাজস্থানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তথা রাজপুত গরিমা ও গৌরবের প্রতীক চিতোরগড়, আজমের থেকে ১১২ কিমি দূরে ও ভিলওয়ারার দক্ষিণে, মেবার প্রদেশে অবস্থিত। ১৫২ ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণীর শীর্ষে অবস্থিত, দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত চিতোর, ৬৯০ একর ভূমির ওপর বিস্তৃত। সাতটি সুদৃঢ় কপাট (যথা রামপোল, ভৈরবপোল, হনুমানপোল প্রভৃতি) দ্বারা সুশোভিত চিতোরগড়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতুলনীয় । শক্তিশালী ছিদ্রযুক্ত প্রাচীর, মজবুত বুরুজ প্রভৃতির ফলে শত্রুসৈন্যর আক্রমণ প্রতিরোধে ছিল সমর্থ। চিতোরগড় শিল্প স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রেও ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। দুর্গের মুখ্য স্মারক 'বিজয় স্তম্ভ', মহারানা কুম্ভ দ্বারা মালব ও গুজরাটের সম্মিলিত বাহিনীর ওপর বিজয়ের স্মারকরূপে নির্মিত হয়। দুর্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগুলি হলো— এক জৈন ব্যবসায়ী দ্বারা নির্মিত 'কীর্তিস্তম্ভ', সরোবরের ওপর অবস্থিত অতুলনীয় 'পদ্মিনীমহল', রাণাকুম্ভের মহল যা ধাত্রীপান্নার অভূতপূর্ব বলিদানের স্মরণ করায়, কুম্ভশ্যাম মন্দির,'মীরা' মন্দির, প্রাচীন কালীমন্দির ও তুলজা ভবানী মন্দির প্রভৃতি। এছাড়া অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হলো কুমার বাঘা সিংয়ের স্মারক, জয়মল-কল্লাজীর ছতরী, বীরপাত্তার ছতরী, কোষাগার 'নওলাখ--- বন্দর', সভাকশ 'দারিখানা' প্রভৃতি। সুবৃহৎ পুষ্করিণীগুলির (কুম্ভসাগর, পদ্মিনী তালাব) ফলে দুর্গে অবরোধের সময় জলের অভাব কখনও দেখা দেয়নি। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীতে মৌর্যরাজ চিত্রাঙ্গ দ্বারা চিতোরগড় নির্মিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে বীর বাপ্পারাওল দ্বারা চিতোরে গুহিলোট বংশীয়দের অধিকার স্থাপিত হয়। গুহিলোট বংশীয় শিশোদিয়া কুলের রাজধানী চিতোর প্রায় আট শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নৃশংস মুসলিম আক্রমণের প্লাবনের গতিরোধ করেছে, হিন্দু সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা রূপে বিশ্ব ইতিহাসে স্থাপিত করেছে ত্যাগ, বলিদান, শৌর্য-বীর্যের এক অনুপম পরাকাষ্ঠা।

১৩০৩ খৃস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর নেতৃত্বাধীন বিশাল বাহিনী চিতোর আক্রমণ করে। অভেদ্য চিতোরগড় ও রাণা রতন সিংহের নেতৃত্বাধীন রাজপুতগণের রণনৈপুণ্যে হতোদ্যম আলাউদ্দিন শঠতার আশ্রয় নিয়ে রাণাকে বন্দী করে। কিন্তু রাণী পদ্মিনীর কৌশল ও বীর গোরা-বাদলের অমিত বিক্রমের ফলে রাণাকে শত্রুশিবির থেকে মুক্ত করে রাজপুতগণ অন্তিম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। রাণী পদ্মিনীর নেতৃত্বে রাজপুত ললনাগণ জৌহরের অগ্নিতে আত্মবিসর্জন করেন, অবশিষ্ট রাজপুতবীরেরা গৈরিক বস্ত্র ধারণপূর্বক দুর্গের কপাট খুলে শত্রু-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীরগতি প্রাপ্ত হন। মালদেব নামক সুলতানী সামন্তের অধিকৃত হয় চিতোর। ১৩১৮ সালে বীর মহারাণা হামীর পুনরায় চিতোর অধিকার করেন এবং শৌর্যবলে বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ অধিকৃত করেন। চিতোর বৈভব ও শক্তির চরম উৎকর্ষে পৌঁছায় রাণাকুম্ভের (১৪৩৩-৬৮) শাসনে। প্রায় সমস্ত রাজপুতানা জুড়ে তাঁর বিজয়পতাকা উত্থিত হয়। মধ্যযুগের লৌহপুরুষ মহারাণা সংগ্রাম সিংয়ের শাসনে চিতোর ভারতের সর্বোচ্চ শক্তিশালী হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়। দিল্লী, মালব ও গুজরাটের মুসলিম রাজ্যগুলিকে তিনি একাধিকবার পরাজিত করেন। খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) সংগ্রাম সিংহের পরাজয় ও অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে দুর্বল হয়ে পড়া চিতোরের ওপর গুজরাটের বাহাদুর শাহ বিপুল বাহিনী সহ আক্রমণ করে। দুর্গের ক্ষুদ্র রাজপুত সৈন্যদল অসীম পরাক্রমে বহুদিন ধরে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করেন, অবশেষে ৮ মার্চ, ১৫৩৫ সালে রাজমাতা কর্মদেবীর নেতৃত্বে ২৩,০০০ রাজপুত রমণী অনলে প্রাণ বিসর্জন দেন। অবশিষ্ট ৩২০০ রাজপুত কুমার বাঘা সিংহের নেতৃত্বে অসীম বীরত্বের সঙ্গে শত্রুসৈন্য সংহারপূর্বক বীরগতি প্রাপ্ত হন। শীঘ্রই চিতোর পুনরায় শিশোদিয়া কুলের অধিকৃত হয়। এই সময়ে রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রবধূ ভক্ত শিরোমণি মীরাবাঈ চিতোর থেকে পুরো রাজপুতানা তথা উত্তর ভারতে কৃষ্ণ ভক্তির মধুর রস সিঞ্চন করেন। চিতোরের মীরামন্দির ও কুম্ভশ্যাম মন্দির আজও সেই মহাসাধিকার অতুলনীয় ত্যাগ ও ভক্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

'হিন্দু স্বাধীনতার' অগ্রদূত চিতোর অধিকার করতে মুঘল বাদশা আকবর স্বয়ং বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে ১৫৬৭ সালে চিতোর আক্রমণ করেন। মেবারী সামন্তগণের সম্মিলিত রায় অনুসারে রাণা উদয় সিংহ বীরশ্রেষ্ঠ জয়মল ও পঞ্চদশ বর্ষীয় পরাক্রমী কিশোর পাত্তার ওপর চিতোর রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে উদয়পুরে প্রস্থান করেন। চারমাসেরও অধিক সময় ধরে রাজপুতগণ বীর বিক্রমে মোঘল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিশোর পাত্তা ও দুই বীর ভাতৃদ্বয় জয়মল ও কল্লাজী রণে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে শত্রুসৈন্য বিনাশ করে মৃত্যুবরণ করেন। নিজ শীল ও সম্মান রক্ষার্থে পাত্তার পাটরাণী ফুলকুওয়ের নেতৃত্বে ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৫৬৮ সালে ৭,০০০ ক্ষত্রিয়ানী চিতায় আত্মবলিদান করেন। প্রবল প্রতিরোধে ক্ষিপ্ত আকবর দুর্গের ৩০,০০০ নির্দোষ জনসাধারণকে নির্দয়ভাবে সংহারের আদেশ দেন। এরপর শিশোদিয়া কুলের অধিকৃত হলেও চিতোরগড় আর তার পূর্ব-গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চিতোরগড় অদ্যপি উন্নত মস্তকে জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করছে মেবারী রাজপুতগণের শৌর্য ও বলিদানের গৌরবময়ী গাথা। ▯

# বৈষ্ণব সাধনার পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

বৈষ্ণবদের প্রধান সম্প্রদায় চারটি। যথা মধবাচার্য বৈষ্ণব, নিম্বার্ক বৈষ্ণব, শ্রী বৈষ্ণব ও রুদ্র বৈষ্ণব। এর মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা মধবাচার্য সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করে সেটির প্রচার প্রসারের ভার দক্ষিণ ভারতের সাধক মধবাচার্যকে প্রদান করে যান। চৈতন্য মহাপ্রভু এই মধবাচার্য সম্প্রদায়ের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেন।

ব্রহ্মার চার পুত্র সনৎ, সনাতন, সনন্দ ও সনক হলেন নিম্বার্ক বৈষ্ণব মার্গের প্রবর্তক। পরে নিম্বার্ক স্বামীর মাধ্যমে এটির প্রসার ঘটে। বিখ্যাত কাঠিয়াবাবা হলেন নিম্বার্ক বৈষ্ণবমার্গের সাধক।

শ্রী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন ভগবান বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী। তিনি রামানুচার্যকে এই সম্প্রদায়ের প্রসারের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। মথুরায় জেলার গোকুলে শ্রী বৈষ্ণবদের প্রধান কেন্দ্র। এঁদের মূল কেন্দ্রের গুরুগণকে গোকুলিয়া গোঁসাই বলা হয়। এই সম্প্রদায় পূর্বোক্ত দুটি সম্প্রদায়ের মতো ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের উপর জোর দেয় না। এরা ধনসম্পত্তি সহযোগেই বিষ্ণুর আরাধনা করে। সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধ্যে গড় হিসাবে শ্রী সম্প্রদায়ের ভক্তদের ধন-সম্পত্তির পরিমাণ সর্বাধিক।

রুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন ভগবান রুদ্র। এই প্রকার বৈষ্ণবরা তৃণের মতো দীন তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন না। এরা রুদ্রদেবের মতোই খুব তেজস্বী হন। বিষ্ণুস্বামীকে এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা বলে মান্য করা হয়।

এই প্রধান চারটি সম্প্রদায় ছাড়াও রয়েছে সহজিয়া সম্প্রদায়। এরা পূর্বে উল্লেখিত চারটি সম্প্রদায়ের মতো অত কঠোর শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মেনে সাধনা করে না। পূর্বোক্ত সাধনাগুলিতে নিরামিষ আহার, নেশার দ্রব্য বর্জন, যৌনসংযম অবশ্যই পালনীয়। সহজিয়া সম্প্রদায়গুলি এসব বিধিনিষেধ মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে। অতীত যুগে নেড়া-নেড়ি, কর্তাভজা, আউল, বাউল, দরবেশ, সখী ভেকি ইত্যাদি অনেক সহজিয়া বৈষ্ণব ছিল। এদের কার্যকলাপ দেখে অনেকেই বিরক্ত হতেন, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তেন। এদের নানা অনাচার ব্যভিচার দেখে চৈতন্য মহাপ্রভু তেরোটি সহজিয়া সম্প্রদায়কে অপসম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে যান। এদের প্রভাব অনেক কমে গেছে। অনেকেই কিছুটা সংশোধন করে নিয়েছেন। অনেকে দিব্যি অনাচার করেই চালিয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব, হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া সম্প্রদায়, অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গ সম্প্রদায়, বালক ব্রহ্মচারীর সন্তানদল সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। অন্যরাও এক ধরনের সহজিয়া বৈষ্ণব। তবে এঁরা খুব একটা বিতর্কিত নন।

এতক্ষণ কোনও সাধক অথবা দেবদেবীদের দ্বারা প্রচলিত নানা মার্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়দের নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা হলো। এখন হাবভাব অনুযায়ী বৈষ্ণবদের শ্রেণী বিভাগ নিয়ে কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। প্রত্যেক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই তিন ধরনের ভাবধারার ব্যক্তি দেখা যায়। যথা ভিক্ষু বৈষ্ণব, গৃহী বৈষ্ণব এবং রাজ বৈষ্ণব।

ভিক্ষু বৈষ্ণবরা বড় করে তিলক কাটবেনই, গলায় তুলসী কাঠের মালা, হাতে জপথলির মধ্যে জপমালা, খোল, খঞ্জনি, কীর্তন এসবে অংশ নেবেনই। একাদশী সহ সহস্র ব্রত উপবাস এঁরা সারা বছর করবেনই। ভিক্ষু বৈষ্ণবদের মধ্যে কেউ সত্যিই ভিখারী হন, কেউ গুরুদেব হন। গুরুদেবরা ভিক্ষা করে করেই সারা বিশ্বে অজস্র বিষ্ণু মন্দির ও আশ্রম নির্মাণ করেছেন। গৃহী বৈষ্ণবরা অনেকেই তিলক কাটেন না, কীর্তনও সবাই করেন না। তবে বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি রেখে প্রতিদিন ধুপধূনা দিয়ে একটু পুজা করেন। কিছু ভোগ বিলাসও এঁদের মধ্যে থাকে। এই প্রকার বৈষ্ণবদের সংখ্যাই সর্বাধিক।

রাজ বৈষ্ণবরা বড় বড় শিল্পী সাহিত্যিক কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ মিলিটারী অফিসার, শিল্পপতি এই সব হয়ে থাকেন। বিড়লা, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ এঁরা এই জাতীয় রাজ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রাজ বৈষ্ণবদের বাইরে থেকে দেখে বিষ্ণুভক্ত বলে চেনা যায় না চট করে। কিন্তু এঁরা অন্তরে রাধাকৃষ্ণের মস্ত বড় ভক্ত হন। এঁরা গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত চর্চা করেন নিয়মিত। মন্দির নির্মাণের পিছনে এঁদের প্রভূত আর্থিক ও হার্দিক সহায়তা থাকে। প্রবন্ধটি সমাপ্ত করার পূর্বে যে কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজনীয় সেটি হলো যে অন্যান্য সাধনার ধারা যথা শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদির মধ্যেও অনুরূপ বিভাগ রয়েছে। অঘোরপন্থি শাক্ত, লিঙ্গায়েত শৈব, রাজ বৌদ্ধ, জৈন ভিক্ষু এসবও রয়েছে। সেগুলি নিয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। ▯

হোতু-কোতু উপাখ্যান

# বর্ণপরিচয় সকলের হাতে পৌঁছোক—এটা চায় হোতু

হোতুর দপ্তরে দুজনের ছবি সবসময় ঝোলে। কেউই তার আত্মীয় নয়। ঠাকুর দেবতাও নয়। ছবি দুটো বেশ বড়ো। যত্নে বাঁধানো। বছরে দুবার করে মালা ঝোলে ছবিতে। জন্মদিন আর মৃত্যুদিনে। অনেক জায়গায় মালা পরাবার ঘটা থাকে। তারপর মালা খোলার দিকে খেয়াল থাকে না। হোতু ভালো দাম দিয়ে টাটকা ফুলের মালা আনে। শিট্টু বাসি-ফুলের মালা এনেছে কয়েকবার। সেজন্যে হোতু নিজেই আনে। সকালে মালা দেয়। সুবাস ছড়ায়। রাতে মালা খুলে নেয়। ছবি সারাবছর সাফসুতরো থাকে। ছবি দুটো কার? বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ। হোতু আর কাউকে অত শ্রদ্ধা করে না।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে দশ হাজার 'বর্ণপরিচয়' ছেপে বিনা পয়সায় বিলি করতে চায় হোতু। কাগজ ছাপা বাঁধা— এসব নিয়ে কত খরচ হবে? আগাম আন্দাজটা পেলে কাজের সুবিধে। টাকাপয়সা আর খাবারে কোতুর লোভ খুব বেশি। ইদানিং হোতুর কানে আসছে কোতুর অনেকরকম কাণ্ডকারখানার কথা। হোতু তাই মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে, কোতুকে একটু কম পাত্তা দেবে। তবে বুঝতে যেন না পারে। কোতু অভিনয়টা ভালোই করে। তোষামোদে কিছুটা অভিনয় তো থাকবেই— এটা হোতু মেনে নিয়েছে। কোতুকে দিয়ে অন্যান্য কাজ হবে।

নারোকুকে ডেকে পাঠাল হোতু। 'বর্ণপরিচয়' ছাপার খরচ কত পড়বে জানতে চাইল। নারোকু যে হিসেব দিল তা বাজারছাড়া। চলতি বাজারের থেকে চারগুণ বেশি। হোতু বলল, 'তোমার লাফ দেওয়ার ইচ্ছেটা ভালো। তবে জেনে রাখো, আমি দর পেয়েছি তোমার থেকে চারগুণ কম। নারোকু বুঝল, কাজটা এলো না হোতু বাজার যাচাই করায়। হোতুর নীতি, ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হবে ঠিকঠাক খরচ করে। নারোকুকে নিরাশ করল না। তাকে বলল, 'একটা কার্ড হবে। বিদ্যাসাগরের ছবি আর কথা দিয়ে। বেশি নিয়ো না। বুঝতেই তো পারছো, লোককে দেওয়া হবে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে।' ছাপার ঠিকেদার নারোকু এবার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলল, 'নিশ্চিন্তে থাকুন। কার্ড ঠিক সময়ে হয়ে যাবে।'

বর্ণপরিচয়-এর অনেকগুলো সংস্করণ বাজারে চলছে। হোতু নির্ভেজাল বই পছন্দ করে। দুটো বই কিনে শ্যামল সাউকে দিল। সে বলল, 'কাল সকালে অক্ষর সাজিয়ে দেবো। প্রুফ পড়ে সংশোধন ঝটপট করে দিলে ছাপাতে বাঁধাতে বেশি সময় লাগবে না।' ছাপা বাঁধার খরচ কত লাগবে জানতে চাইল হোতু। শ্যামল জানাল 'ছাপা বাঁধায় লাভ করবো না। যা খরচ হবে তার চার ভাগের এক ভাগ দিলেই হবে।' ছাপার খরচ কম হলো। অক্ষর সাজানোয় দক্ষ মানুষ অমল রায়। তিনি অর্ধেক টাকায় কাজ করে দেবেন বললেন। হোতুর কাগজের ব্যবসা। ভালো কাগজ কত লাগবে দশ হাজার কপি বই ছাপার জন্যে তা মুখে মুখে হিসেব কষে ফেলল। দেখা গেলো এক টাকার মতো খরচ পড়বে। প্রকাশন সহযোগিতায় শ্যামল সাউ অমল রায়ের নাম থাকবে।

বই ছাপতে যাওয়ার আগে সব ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিলো হোতু। বিদ্যাসাগরের ছবি থাকছে বইয়ের মধ্যে। ভিতরে লেখা থাকল, 'বর্ণপরিচয় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়ানো। আমরা এ বই সকলের হাতে পৌঁছে দিতে চাই বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। আর চাই সকলে লিখতে পড়তে শিখুক। মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। মনে রাখুক সবসময়, শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না। চিরদিনের বই 'বর্ণপরিচয়' নিজে পড়ুন। অন্যদের পড়ান।'

বই চলে এল বিদ্যাসাগরের জন্মদিনের দুদিন আগে। কোতুকে বলল, 'তুমি চিকলি আর শিট্টুকে নিয়ে বইগুলো বিভিন্ন জায়গায় দিয়ে আসবে। সেজন্যে তোমরা মজুরি পাবে। বই যেন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছোয়।' বইয়ের মধ্যে বিতরণ-সহযোগী হিসেবে কোতু চিকলি শিট্টুর নাম ছাপা রয়েছে। শিট্টু জিগ্যেস করল, 'সব বিনা পয়সায় দেবো?' হোতু বলল, 'তোমার খাটনির জন্যে মজুরি পাবে। একটা বইও যেন অন্যভাবে কোথাও না যায়।'

হোতু মনে মনে ভাবল, কোতু চিকলি শিট্টু যত ধুরন্ধর হোক বিদ্যাসাগরের জন্যে একটু মন দিয়ে কাজ করবে। কোনও কোনও সময় লোককে ভরসা না করে উপায় কী!

**কৌশিক গুহ**

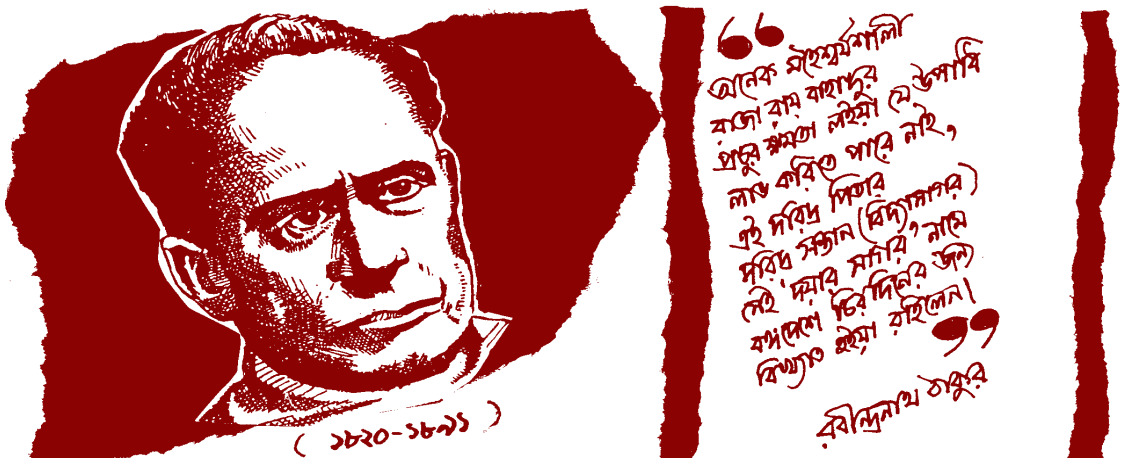

## বই কথা কই

# লেখাপড়ার জন্যে শ্রম চাই



অজয় স্যার কয়েকটা কথা বড়ো বড়ো করে লিখে নকশা তৈরি করেছেন। নিজের লেখা নয়। বিদ্যাসাগরের লেখা।

১। শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখাপড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।
২। যে বালক প্রত্যহ, মন দিয়া, লেখাপড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া, লেখাপড়া শিখ, সকলে তোমায় ভালবাসিবে।
৩। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না; অধিক দিন মনে থাকিবে না; পড়া বলিবার সময় ভাল বলিতে পারিবে না।

কথাগুলো সুন্দরভাবে ছেপে কার্ড তৈরি হলো। চেনা, অল্পচেনা, না-চেনা অনেককে উপহার দিলেন। তাঁর ইচ্ছে, সেগুলো যত্ন করে রেখে দেবে সবাই। মাঝে মাঝে দেখবে। পড়াশোনাকে ভালোবাসবে।

**বইমিত্র**

## প্রশ্নবাণ

১. ভারতে দুগ্ধ বিপ্লবের সংগঠক কে? তাঁর জন্ম মৃত্যু?
২. 'মন্থন' ছবির পরিচালক কে? তৈরিতে কত টাকা খরচ হয়েছিল? কত টাকা দিয়েছিল কারা?
৩. 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।' এ গান কার লেখা? কোথায় ছিল?
৪. 'ভোম্বল সর্দার' কাহিনীর লেখক কে?
৫. 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে'। কার লেখা? তিনি কার মা?

**উত্তর :** ১. ভার্গিস কুরিয়ান। ২৬ নভেম্বর ১৯২১—৯ সেপ্টেম্বর ২০১২। ২. শ্যাম বেনেগাল। ১০ লক্ষ টাকা। দু টাকা করে দিয়েছিল আনন্দ- এর ৫ লক্ষ দুধ উৎপাদনকারী। ৩. রবীন্দ্রনাথের। বাল্মীকি প্রতিভা। ৪. খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ৫. কুসুমকুমারী দাশ। জীবনানন্দ দাশ।

## ছোটোদের বলছি

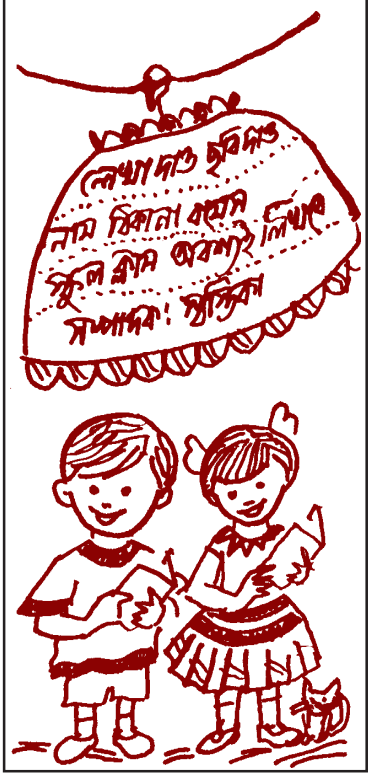




## উলটো পালটা

অনেক অফিসের মতো সেখানেও এক নামে দুজন কাজ করে। নাম আর পদবী এক না হলে সমস্যা কম। পদবী ধরা যায়। কিন্তু নাম ও পদবী এক হলে অন্য কোন পদ্ধতি নিতে হয়। অফিসে গোলমাল মানিক নিয়ে। দু'জন মানিক। কেলে মানিক গোরা মানিক নাম দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেটায় আপত্তি ছিল মানিকদের। এক মানিক খুব পড়ে, অন্য মানিকের সাজগোজে ঝোঁক বেশি। নাম একজনের 'পড়ামানিক'। অন্যজনের 'পরামানিক'। বিচক্ষণ সহকর্মী বললেন, 'রেহাই মিলবে না। দুই মানিকই পরে আপত্তি করতে পারে।' এক কর্তাব্যক্তি বললেন, 'ততদিনে নামটা চালু হয়ে যাবে।' কে আর তখন শুনছে!

॥ ২ ॥

কাজের জায়গায় কর্তাদের খুশি রাখার নানারকম পদ্ধতি রয়েছে। সবই অলিখিত। তবে কর্তার তোষামোদে অনেকে বেশ দক্ষতা দেখায়। মোহন দাস খুব ভালো রপ্ত করেছে। সে গ্রামের বাড়ি গিয়ে অনেকদিন আসেনি। মাইনেটাই



বন্ধ। তিনমাস বাদে অফিস ঢুকল মানিকতলা বাজার থেকে একটা বড়সড় ইলিশ কিনে। কর্তার ঘরে ঢুকেই প্রণাম করে বলল, 'বাবু, অনেকদিন আসতে পারিনি। পুকুরে এই ইলিশটা ধরলুম সকালে। নিয়ে এলুম আপনি ভালোবাসেন বলে।' কর্তা লোকচরানোয় দক্ষ। বললেন, 'তোর তিন মাসের মাইনে কাটা হবে না। তোর ক্ষমতা অসাধারণ। পুকুরে যখন ইলিশ চাষ করিস!'

**রামগরুড় সংকলিত**

# তেজস্বিনী তিনকন্যা কথা

**প্রীতি বসু**

প্রথমেই বলি সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথা। তবে এখানে একথাও বলে রাখি তিনি বিশেষভাবে সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতা হলেও মহিলা কবি হিসেবেও যথেষ্ট শক্তিময়ী। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৩ সালে। বেশ

*জ্যোতির্ময়ী দেবী*

*ভেরোনিকা গুরিন*

ছোট বয়স থেকেই তাঁর লেখনীশক্তির প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর জীবনকাল ১৮৯৪ থেকে ১৯৮৯ সাল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এক বৈচিত্র্যময়তার সমন্বয় ঘটেছিল। একদিকে পিতৃপিতামহের কোলে সমাদরে আদৃত হয়েছেন, অন্যদিকে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সাথীহারা হয়েছেন। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের সমন্বয়ই তাঁকে স্বচ্ছ লেখনীর পথে এগিয়ে দিয়েছে। তিনি বহু দেশ বিদেশে ঘুরেছেন। বিভিন্ন জায়গার সমাজ সংসারকে খুব অন্তরঙ্গভাবে দেখেছেন এবং তাই তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা বাংলা হলেও লেখা তাই সর্বভাষী উঠেছে। শেষ করছি তাঁর লেখনীর দুটি অংশ তুলে দিয়ে— মাত্র দ্বাদশ বর্ষীয় বালিকা জ্যোতির্ময়ী কবিতা লিখেছিলেন 'বসন্তবর্ণন' কবিতা। তার একটি অংশ হচ্ছে—

শীতঋতু করে শেষ বসন্ত আইল/ হায় কি সুন্দর সাজে ধরণী সাজিল/ প্রকৃতি প্রকৃত বেশ ধরিল এখন/ হেরিয়া ফুল্লল হলো ভাবুকের মন/ কোকিল আইল দেখ বসন্তের সঙ্গে/ ভূলোক পুলক হলো সুখের আশাতে/

স্ত্রীজাতির অপমান লাঞ্ছনার ইতিহাস কিভাবে চাপা পড়ে আছে, সেটি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন— ছোটবেলায় কিছু স্তব শিখেছিলাম। মহাদেবের স্তব। তার একটা শ্লোকে আছে—

'অসিত গিরিবর স্যাৎ কজ্জলং/ সিন্ধুপাত্রে সুরতরুবরশাখা লেখনীম্ পত্রউর্বী লিখতি যদি সারদা গৃহিত্বা সর্বকালম্।' অর্থ হলো অসিতগিরির মতো কালি যদি সিন্ধুপত্ররূপী দোয়াতে রাখা হয়, কল্পতরুর কলমে চিরকাল ধরে পৃথিবীর পাত্রে স্বয়ং সারদা যদি লেখেন তাহলেও তোমার মাহাত্ম্য কথা বলা শেষ হবে না— এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছেন তাঁর মনে হয়েছে, যদি সিন্ধু ভরা রক্তের কালিতে মহাকালের ইতিহাসের পাতায় সত্যিই যদি সরস্বতী আমাদের (নারীদের) লাঞ্ছনা বেদনার ইতিহাস লিখতেন, তাহলেও আমাদের (নারীদের) দুঃখ-অপমানের কথা লিখে সমাপ্ত করতে পারতেন না। প্রায় শতাব্দীকাল জীবিত থেকে নারীদের উন্নতমস্তকে চলবার পথ দেখিয়েছেন তিনি।

এবার বলি মাসুদা রহমানের কথা। যিনি তেজোদীপ্ত, বলিষ্ঠ লেখনীর জন্য মিসেস এম. রহমান নামে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি হুগলী জেলার শেরপুর গ্রামে ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম খান বাহাদুর মজহারুল আনওয়ার চৌধুরী ও মা বেগম মোয়াজাতুন্নেসা। সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত পরিবারে মিসেস এম. রহমান খুব সামান্য বাংলা, উর্দু ও কোরান পড়তে শিখেছিলেন। খুব ছোট বয়সেই ফুরফুরার জমিদার ও রেজিস্ট্রার অফ ক্যালকাটা কাজী মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। নজরুল তাঁকে মা বলে ডাকতেন। মিসেস এম. রহমান ১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল কুমিল্লার প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে নজরুলের বিয়ে দিয়ে হুগলীতে তাঁদের সস্ত্রীক থাকার ব্যবস্থা করে দেন। নজরুল তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিশেষ কদর করতেন।

তিনিও নজরুলকে এত ভালবাসতেন, আর তেজস্বিনী তো ছিলেনই— তাই নজরুল এক সময়ে যখন কারারুদ্ধ হতে চলেছেন, তখন তাঁর প্রভাবসম্পন্ন পিতাকে নজরুলকে সহায়তা করতে বলেছিলেন। কিন্তু পিতা তা না করায় পিতাকে বলেছিলেন— তিনি পিতৃগৃহে আর যাবেনই না! গেলে তাঁর লাশ যাবে। তিনি তাই পালন করেছিলেন। জানা যায়, বৃটিশ-বিরোধী হওয়ার কারণে তিনি খদ্দরের কাপড় পরতেন এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর কফিনও খদ্দরের কাপড়ে তৈরি হয়েছিল। তাঁর লেখনীর সময়কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর 'আমাদের দাবী' প্রবন্ধের একটি অংশ তুলে দিয়ে তাঁর কথা শেষ করছি— নারীদের অপমানকারী পুরুষদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— রক্তলোলুপা বাঘিনীরূপে অপমান- কারীদের হৃদয়ের রক্ত বেদনার শরম বেদনার উপশম করবো দলিতা ফণীরূপে ঝলকে ঝলকে বিষোদ্গার করে, দংশনে দংশনে তাদের জর্জরিত করে তীব্র অপমানের জ্বালা ভুলবো।

শেষে বলি, ন'য়ের দশকের বিদেশিনী এক সাহসী সাংবাদিকের কথা। নাম— ভেরোনিকা গুরিন। তিনি ১৯৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৯৬ সালে আততায়ীর হাতে খুন হন। তিনি ডাবলিনের 'Sunday Independent' পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। তিনি আয়ারল্যান্ডের কুখ্যাত ক্রিমিনাল আন্ডার ওয়ার্ল্ডের কার্যকলাপ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে থাকায় বহুবার আক্রান্ত হন। কিন্তু অসমসাহসী ভেরোনিকা কিছুতেই দমে যাননি। তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকার জগৎকে বাইরে টেনে আনতে পিছুপা হননি। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি এক মোটর সাইকেল আরোহী আততায়ী ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ করে তাঁকে হত্যা করে। ▯

*(২৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ব কন্যা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)*

# আসুন, আমরা সবাই মিলে বর্ষার মুণ্ডুপাত করি

**ওগো বর্ষা,**

তোমার ঠিকানা জানি না। তুমি ভেসে ভেসে বেড়াও। তাই এই চিঠিও উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায় হাওয়ায়। কবি তোমায় বলেছিলেন, 'ওগো বর্ষা তুমি ঝোরো না গো এমন করে'। আমার এই চিঠি পেলে জানি তুমি কাঁদবে। তবু আমি বলব না, 'ওগো বর্ষা তুমি কেঁদো না গো এমন করে'। বরং বলব, কাঁদো, কাঁদো আরও কাঁদো। কেঁদে কেঁদে ভেসে যাও। যে হারে পলিটিশিয়ানরা তোমায় শাপ-শাপান্ত করছে, গাল-মন্দ করছে তাতে কাঁদাই উচিত।

তোমাকে নিয়ে আমাদের আদিখ্যেতার অন্ত নেই। গানে, কবিতায়, প্রেমে, পূজায় তোমায় 'গ্যাস' খাওয়ানো শুধু বাঙালির নয় তামাম দেশের রেওয়াজ। অথচ মনমোহন সিং থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তোমার বাপ-বাপান্ত করতে কেউ কম যায় না। সবেতেই দোষ বর্ষার। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন তুমি শাঁখের করাতে পা দিয়ে আছো। উদাহরণ চাই?

**জনগণ :** রাস্তাঘাটে এত জল জমে কেন? এত মশার উপদ্রব কেন? পাকা রাস্তা খানা-খন্দে ভরা কেন?

**পুরসভা :** কী করব মশাই? বর্ষার যা উপদ্রব! নিকাশি ব্যবস্থার তুলনায় বৃষ্টি হচ্ছে বেশি। তাই জল জমছে। আর জল জমা মানেই মশা জন্মাচ্ছে। আর বৃষ্টির জলে রাস্তাঘাট খারাপ হয়ে যায়। পিচ উঠে যায়।

**জনগণ :** ডেঙ্গি-তে এত লোক মরছে কেন? পুরসভা ব্যবস্থা নেয়নি? রাজ্য-সরকার কেন আগাম ভাবেনি?

**পুরসভা ও সরকারের যৌথ জবাব :** আমরা কী করব? ঠিক মতো বৃষ্টি হয়নি বলেই তো এত মশা। কামড়ে কামড়ে মানুষ মারছে। অসভ্য বেহায়া বৃষ্টি সময় মতো না হলে কী করার আছে। আমরা তো ডেঙ্গি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডবিল ছেপেছি। বিজ্ঞাপনের জন্য ফিল্ম আর্টিস্টদের দিয়ে শ্যুটিং করিয়েছি। ওদের ডেট পেতে একটু যা দেরি হয়েছে। কিন্তু বর্ষা যদি ঠিকঠাক ডেটে আসত তবে তো কথাই ছিল না। ডেঙ্গিকে লেঙ্গি মেরে দিতাম।

বর্ষা, তুমি বুঝতে পারছ শাঁখের করাত কাকে বলে। তুমি এলেও মশা, না এলেও মশা। ভাবটা এমন যেন ডেঙ্গির মশা মারার টেন্ডার দেওয়া হয়েছে তোমায়। আবার তোমাকেই খেয়াল রাখতে হবে কোন শহরে নিকাশি ব্যবস্থা কেমন। সেই বুঝে অল্প ঝরবে না বেশি, সেটা তোমাকেই ডিসাইড করতে হবে।

ক'দিন আগে কাঁচা লঙ্কার কেজি হলো দু'শো টাকার কাছাকাছি। বাকি সবজির দামও আকাশে ঘুড়ি হয়ে উড়ছে। বলা হলো ঠিক সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় বাজার আগুন হয়ে গেছে। কবে হয়তো বলবে সময় মতো বৃষ্টি নামতে পারেনি বলে স্টিফেন কোর্ট পুড়ল, আমরি হাসপাতাল মৃত্যুপুরী হলো। দাম বাড়ানোর দোষ তোমায় দিয়েছে বলে আবার বেশি ঝরো না। তখন দেখবে সবাই বলবে বৃষ্টিতে ফসল পচল। তাই বাজার আগুন।

কিন্তু বর্ষা, এই আগুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় ম্যানমেড। ফড়েরা পয়সা লুটছে। শিখণ্ডী তুমি। ফড়ে দালালরা বলছে, পার্টিকে পয়সা দিতে হচ্ছে গাদা গাদা। আগে শুধু একটা লোকাল কমিটিকে দিতে হোত। এখন একটা লোকালিটিতে যত নেতা তত লোকাল কমিটি। সবাইকে ট্যাক্স দিতে হয়। দাম তো বাড়াতেই হবে। নায্য কথা। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। মুখ্যমন্ত্রী দিদিমণি বলেছেন, ছবি বিক্রি করে পয়সা তুলবেন। কিন্তু লোকাল কমিটি ব্যবসায়ীদের থেকেই তুলবে। আর সেই পার্টি কর দিতে গিয়ে বাজারে গিয়ে ছবি হয়ে যাবে আম জনতা। কাঠগড়ায় উঠবে বর্ষা। দেশে মুদ্রাস্ফীতিতেও তো বর্ষা তোমারই হাত। পেট্রল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস, বিদেশে কালো টাকা, লোকপাল বিল, এফ ডি আই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এসবেও তোমার কালো হাত থাকার অভিযোগ উঠতেই পারে।

বর্ষা তুমি জান না যে, তোমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও কম নেই। প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি এলাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে না পারলেও দোষ তোমার। আবার অনাহারে কৃষক মরলে, ঋণের জ্বালায় কৃষক আত্মঘাতী হলেও ভিলেনের নাম অনাবৃষ্টি। ওটুকু বলে দিলেই প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সব্বার দায়িত্ব খালাস। তোমায় ধরার ফর্মুলা জানা থাকলে দায়িত্বে অবহেলা এমনকি দফা ৩০২-তে মামলাও রুজু করত!

কৃষি নির্ভর এই দেশের অর্থনীতি তোমার ওপর বড়ই নির্ভরশীল। জলভরা মেঘের দিকেই তাকিয়ে থাকে আমাদের অর্থনীতি। তাকিয়ে থাকে আমাদের কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন। প্রকৃতির কোন খেয়াল জানি না, ইদানীং সত্যিই তুমি খুব লেটলতিফ। আষাঢ়, শ্রাবণে কম ঝরেও ভাদ্রে পুষিয়েও দিয়েছ। আবহাওয়া দফতরের হিসেবে মতো তুমি এই বছরে দায়িত্বে ফাঁকি দাওনি। জুন থেকে অগাস্ট দেশে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল মাত্র ১২ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে সেটা আরও কমেছে। তাই বর্ষা নিয়ে এ বছর অন্তত হতাশার কোনও কারণ নেই। আশা করা যাচ্ছে খরিফের পর রবি মরসুমেও সেচের কাজে অসুবিধা হবে না।

কিন্তু অসুবিধা হবে। না, বর্ষা তোমার জন্য নয়। তুমি তো আর গ্রামে গ্রামে সেচের ব্যবস্থা করবে না। জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করবে না। তোমাকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কিংবা পানীয় জল উৎপাদনের উদ্যোগ নেবে না। নদীর পারকে ভাঙানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তুমি বড় জোর নদীকে বলতে পার, নদী তুমি নদীতেই থেকো, মানুষের ঘরে ঢুকো না। কিন্তু নদী তো নিজের গতিতেই এগোয়। ঠিক যেমন করে কমনওয়েলথের হাত ধরে টুজি, টুজির হাত ধরে ক্যাস ফর ভোট, কয়লা কেলেঙ্কারির পর কেলেঙ্কারি এগিয়ে যায়। মানুষের ঘরে ঢোকে। রাজনীতিক দাদাদের হাত ধরে ফড়ে দালালরা, আর তাদের হাত ধরে বাজারে আগুন ছড়ায়। সেই আগুনে হাত পোড়ে সাধারণের । বৃষ্টি, তুমি একটি ওদের কথা ভেবো। ওদের জন্য কেঁদো। সময় মতো কেঁদো। বাজার, অর্থনীতি, মুদ্রাস্ফীতি শিল্প, অনাহার, ডেঙ্গি তোমার হাতেই ওদের সব রকমের বাঁচা মরা। অভিভাবকহীন ভারতকে রক্ষা করো।

— **সুন্দর মৌলিক**

# সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ আর কত দিনে হবে?

অতিথি কলম

ডঃ শিবকুমার রায়

"সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আফতাব আলম এবং বিচারপতি সি কে প্রসাদ-এর ডিভিসন বেঞ্চ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য কাসভকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি এখানে দেওয়া যায় না।"

এভাবেই মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ধৃত একমাত্র জীবিত পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী মহম্মদ আজমল কাসভের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত।

"মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কংগ্রেসের যুবনেতা ও সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীর বিবৃতি ছিল— সন্ত্রাসবাদী হামলা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাহুল গান্ধী আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, মুম্বাই-এর মতো হামলা তো ইরাক-আফগানিস্তানে প্রতিদিন অহরহ ঘটে চলেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তুলনা কী আমরা ইরাক-আফগানিস্তানের সঙ্গে করব?"

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর সন্ত্রাসবাদী হামলায় ১৬৬ জন মারা গিয়েছিলেন। কাসভ বাদে অন্য নয়জন পাক-সন্ত্রাসবাদীকে ভারতীয় নিরাপত্তারক্ষীরাই লড়াই করে হত্যা করেছিল। জীবিত অবস্থায় ধরা পড়েছিল একমাত্র কাসভই। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে— এদেশে আইন তার নিজের পথেই চলে। কাসভ প্রকাশ্যে নিরীহ নিরপরাধ নিঃশস্ত্র লোকেদের উপর গুলি চালিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এদেশের আইন অনুসারে ওরকম ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীকেও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তার ফলেই সর্বোচ্চ আদালতে তার মামলা পৌঁছেছিল। হাইকোর্ট আগেই তাকে তার ফাঁসির আদেশ শুনিয়ে দিয়েছিল।

এবিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে সারা দেশই আনন্দিত এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাত-পাত, মত-পন্থের ঊর্ধ্বে সারা দেশ এক। ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদ আজ আর কোনও একটি রাজ্য বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, এর শিকড় অনেকগুলো রাজ্যেই ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসবাদের কারণে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

কেবলমাত্র দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বাইয়ে ১২ মার্চ ১৯৯৩-এর ধারাবাহিক বিস্ফোরণ এখনও মানুষ ভুলতে পারেনি। (ওই বিস্ফোরণে প্রায় তিনশত মানুষ মারা যান, আহত অনেক)। ২০০২-এর ডিসেম্বর মাসে ঘাটকোপার বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু, ২০০৩-এ ভিলে-পার্লে-তে বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু, ২০০৩-এ মুলুন্দ-এ ট্রেনে বাসে বোমা বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যু, পরে জাভেরি বাজার এবং গেটওয়ে অফ্ ইন্ডিয়ার

কাছে রাখা গাড়ীবোমা বিস্ফোরণে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন, আহত আরও অনেক। ২০০৫-এ লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণে ২০০৯ জন নিহত হন। এই কয়েকটি ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের দেশের সত্যিকার আর্থিক রাজধানী মুম্বাইকে কীরকম টার্গেট করেছে। ওই নররাক্ষসরা মুম্বাই-এর পরিস্থিতি বিগড়ে দিয়ে ভারতরাষ্ট্রকেই দুর্বল করতে চাইছে।

রাজধানী দিল্লীতেও কয়েকবার ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। দেশের সংসদ থেকে দিল্লী হাইকোর্টও সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য থেকে রেহাই পায়নি। ওই সকল উচ্চনিরাপত্তাব্যবস্থা সমন্বিত এলাকাতেও সন্ত্রাসবাদীরা আঘাত হানতে সফল হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের প্রাণের বিনিময়ে দেশের সম্মানরক্ষা করেছেন।

যখন সন্ত্রাসের লেলিহান শিখা দেশের আত্মসম্মানের প্রতীক সংসদকে দগ্ধ করছে তখন দেশের তাবড় রাজনৈতিক নেতারা সেই আঁচে রাজনৈতিক রুটি সেঁকেছেন। যখন সংকল্পবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ সরকার ও বিরোধীদের একযোগে সন্ত্রাসের মোকাবিলায় অগ্রসর হওয়া উচিত তখন তাঁরা 'সন্ত্রাস-দমন' নিয়ে রাজনৈতিক পাশা খেলছেন। এ কারণেই সংসদভবনে হামলাকারী আফজল গুরুকে ফাঁসির সাজা দেওয়ার পরও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। আমেরিকা যখন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংসের পর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোমর কষে লড়াই-এ নেমে আর কোনও হামলাই করতে দেয়নি, তখন কিন্তু ভারতবর্ষের নেতারা 'সন্ত্রাস' নিয়ে রাজনীতি করছেন। ইউ পি এ সরকারের কি ওই মৃত্যুদণ্ড তৎক্ষণাৎ কার্যকর করার মতো ইচ্ছাশক্তি আদৌও বাস্তবে আছে? তামিলনাড়ুতে রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদের 'ফাঁসির আদেশ' নিয়ে তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার 'রাজনীতি' শুরু করে দিয়েছিল। তখন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা টুইটারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন— জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা এরকম করলে (আফজল গুরুর মৃত্যুদণ্ড) সারাদেশ জুড়ে কি প্রতিক্রিয়া হোত? আফজল গুরুর ব্যাপারে ওমর আবদুল্লার সঙ্গে কংগ্রেসীদের মতামতের কোনও ফারাক নেই। আফজল গুরুর (সংসদ আক্রমণে জড়িত) যখন ফাঁসির সাজা ঘোষণা হয় তখন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ। তিনি বলেছিলেন আফজল গুরুকে ফাঁসি দিলে জম্মু-কাশ্মীরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এরকম নেতাদের কোনও অভাব নেই। কংগ্রেস দলের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিগ্বিজয় সিং দিল্লীর বাটালা হাউস এনকাউন্টার নিয়ে অনেকবার প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি ওই মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত পুলিশ অফিসার মোহনচাঁদ শর্মার পরিবারের প্রতি কোনও ইতিকর্তব্য নেই, তবে তিনি উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের সঞ্জয়পুরে এনকাউন্টারে নিহত সন্ত্রাসবাদীদের পরিবারে গিয়ে সহমর্মিতা জানাতে কোনওরকম কার্পণ্য করেননি। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে যখন দুনিয়ার কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী লাদেন মারা যায় তখনও দিগ্বিজয় সিং তাকে সমাধিস্থ করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সন্ত্রাসবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'বাক্‌চাতুর্য এবং তুষ্টীকরণের রাজনীতি' করে চলেছে— এটা আর কতদিন চলবে? আমেরিকায় বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ২০০১-এর ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হয়। আমেরিকা লাদেনের মতো সন্ত্রাসবাদীকে পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে মেরে সমুদ্রে লাশ ভাসিয়ে দিতে কোনও সংকোচ করেনি। আর আমাদের সরকার আফজল গুরুর ফাঁসির সাজা হওয়ার পরও তা কার্যকর করতে এখনও কোনও সিদ্ধান্তেই আসতে পারেনি।

'সন্ত্রাসবাদ' বিষয়ে কংগ্রেসের তোষণনীতির ফলে দেশের মুসলিম জনতার নিষ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দেবে। দেশের বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন, সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসবাদীদের কোনও ধর্ম হয় না। যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কংগ্রেসের যুবনেতা ও সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধীর বিবৃতি ছিল— সন্ত্রাসবাদী হামলা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। রাহুল গান্ধী আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, মুম্বাই-এর মতো হামলা তো ইরাক-আফগানিস্তানে প্রতিদিন অহরহ ঘটে চলেছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তুলনা কী আমরা ইরাক-আফগানিস্তানের সঙ্গে করব? আমরা কি চোখে দেখতে পাচ্ছি না যে আমেরিকা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র-এ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কতখানি সুদৃঢ় করেছে।

এটা অবশ্য আলাদা— দিগ্বিজয় সিং রাহুল গান্ধীকে আড়াল করতে দেখা গিয়েছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হামলার জন্য মুম্বাইয়ের ভীড়-ভাড় ও ছোট অলিগলিকে দায়ী করেছেন। চিদম্বরমের বক্তব্য মুম্বাইয়ের গলি এতটাই সংকীর্ণ যে দু'পা দুজনে একত্র হাঁটা যায় না। তবে দিল্লী হাইকোর্টকে তো আর সংকীর্ণতার দোষে দুষ্ট করা যায় না। আর ভীড়ের চাপে আক্রান্তও বলা যায় না। অতিরিক্ত নিরাপত্তাযুক্ত হাইকোর্ট এলাকায় সন্ত্রাসবাদীরা কি করে হামলা চালাতে সমর্থ হয়েছিল? দেশের স্বরাষ্ট্রদপ্তর এখন সুশীল সিন্ধের হাতে। এখন দেখা যাক উনি কী করেন? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কতটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন! আগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম্ সাহেবের কথা ছিল— সন্ত্রাসবাদী হামলা ঠেকানোর জন্য দেশের সর্বসাধারণ জনগণকে সজাগ থাকতে হবে। এটা তো ঠিক। কিন্তু দেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকেও সজাগ এবং সতর্ক থাকতে হবে। যদি সরকার সত্যিসত্যিই সজাগ সতর্ক থাকত তাহলে কি পাকিস্তানকে প্রদত্ত ৫০ জন 'মোস্ট ওয়ান্টেড' ব্যক্তির তালিকায় মহারাষ্ট্রের থানেতে বসবাসকারীর ব্যক্তির নাম ঢোকানো হোত? যদি নিরাপত্তা সংস্থার সূচনা এবং সতর্কবাণী সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় তাহলে তার দায়িত্ব কার?

জনগণ আর ওই বহু-উচ্চারিত আশ্বাসবাণীতে 'সন্ত্রাসবাদীদের কোনওরকম ভাবেই ছাড়া হবে না' আর ভুলছে না। মহম্মদ আজমল কাসভকে ফাঁসির সাজা সত্বর কার্যকর করা উচিত আর আফজল গুরুর আবেদনেরও নিষ্পত্তি শীঘ্রাতিশীঘ্র করা উচিত।

*(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)*

# উত্তরপ্রদেশের সামাজিক সম্প্রীতিকে আড়াআড়ি ভাগ করে দিয়েছে সমাজবাদী পার্টির সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** এই স্বল্প সময়ের রাজত্বে উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে তোষণ করেই চলেছে। মাঝেমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যাদব তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছেন, তাদের সমর্থনে সমাজবাদীপার্টি আজ উত্তরপ্রদেশে সরকার গঠন করতে পেরেছে। যদিও দাঙ্গাপীড়িত বেরিলিতে এখনও উত্তেজনা রয়েছে। এদিকে সব রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলায় অখিলেশ যাদবের সরকার দায়ী বলে অভিযোগ করছে।

*মুলায়ম সিং যাদব*

*অখিলেশ সিং যাদব*

এই সরকারের বয়েস এখনও এক বছর পুরো হয়নি। প্রথম পাঁচ মাসেই ৫টা দাঙ্গা ঘটে গেছে। বেরিলিতেই দু'বার। এছাড়া মথুরা, এলাহাবাদ এবং লক্ষ্ণৌতে। দাঙ্গাগুলিতে এযাবৎ নিহত হয়েছে ৭ জন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বর্তমান সরকারের আমলে প্রথম দাঙ্গাটি শুরু হয় ১ জুন মথুরায়। শেষ দাঙ্গাটি হয়েছে লক্ষ্ণৌতে। সেসময় একজন ফটোগ্রাফারকেও মুসলিম দুষ্কৃতীরা প্রচণ্ড মারধোর করে। ওই ফটো-সাংবাদিকের কাগজ নাকি হিন্দুদের হয়ে লিখেছে। অসম ও মায়নামারে মুসলিমদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার কথা যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করেনি। দাঙ্গাকারীরা লক্ষ্ণৌর পার্কে প্রতিষ্ঠিত সন্ত মহাবীর ও ভগবান বুদ্ধের মূর্তিও ভাঙচুর করে। সাংবাদিক ও ফটো-সাংবাদিকের নিগ্রহের প্রতিবাদে ঘটনার দু' ঘণ্টা পর লক্ষ্ণৌর হজরতগঞ্জ মোড়ে সাংবাদিকরা ধর্ণায় বসে এবং বিক্ষোভ দেখায়। হাঙ্গামাকারী ও সাংবাদিকদের যারা নিগ্রহ করেছে তাদের গ্রেপ্তারের দাবী জানায় এবং নিগৃহীত সাংবাদিকদের ক্ষতিপূরণ দাবী করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজ্যের প্রধান সচিব (গৃহ) এসে এই দাবীর বিষয়ে আশ্বস্ত না করছেন ততক্ষণ ধর্ণা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা।

এদিকে রাজ্যের পুলিশবাহিনীর নৈতিক মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। কেননা অখিলেশ যাদবের সরকার দুষ্কৃতী ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোরানের অবমাননা হয়েছে এই অভিযোগে ২০১১-র ৬ জুলাই মোরদাবাদে পুলিশের উপর যারা হামলা চালিয়েছিল এমন অভিযুক্ত ৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সরকার শুরু করে দিয়েছে বলে খবর।

প্রশ্ন উঠেছে, যারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর প্রতিকৃতির ক্ষতি করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা আনা হয়েছে। তাহলে যারা ভগবান মহাবীর ও বুদ্ধ-র প্রতিমূর্তি ধ্বংস করেছে, তাদেরকেও ওই একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে না কেন? ভগবান মহাবীর ও বুদ্ধের মূর্তি আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেননা হিন্দু সংস্কৃতিতে ভাঙা মূর্তির পূজা করার রীতি নেই বলে দাবী করেছে রাজ্যে বিজেপি-র নেতারা।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই রয়েছে। এটা বড় উদ্বেগের বলে রাজ্য বিজেপি-র সহ-সভাপতি জানিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে সরকার যদি প্রথমেই কড়া হাতে এই দাঙ্গার মোকাবিলা করত, তাহলে দুষ্কৃতীরা নতুন করে এরকম হিংসাত্মক দাঙ্গা ঘটাতে সাহস পেত না।


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

# বোড়োল্যান্ডের ২.৩ লক্ষ বিঘা খাস জমি অনুপ্রবেশকারীদের দখলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রিত 'দি বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট' (বি পি এফ) বলেছে, তাদের অধীনস্থ জেলাগুলির ২.৩২ লাখ বিঘে সরকারি খাস জমি প্রায় ৪০ হাজার লোক, যাদের বেশিরভাগ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দখল করে বসে আছে। এই মর্মে তাদের পক্ষ থেকে একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে বলে বি পি এফ নেতা দারাও নারজেরি (Darao Narzary) জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "অনুপ্রবেশকারীদের দখল থেকে এইসব খাস জমি আমরা এখনই উদ্ধার করতে চাই। এ ব্যাপারে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে বোড়োল্যান্ড সিটিজেন্স ফোরাম গুয়াহাটি হাইকোর্টে যাবে। জনজাতিদের জমি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নেওয়ার কারণেই সম্প্রতি বি টি এ ডি-র অধীন চারটি জেলায় জাতিদাঙ্গা ঘটে গেল। চারটি জেলার সদর দপ্তর থেকে এই বিষয়ে বিশদ তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি। এতে প্রমাণ হচ্ছে সরকার সব জেনেশুনেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।"

বি পি এফ-এর তথ্য

| জেলা | দখলকারীদের সংখ্যা | জমি |
|---|---|---|
| কোকরাঝাড় | ২০,৪২৩ | ১,৩০,২৬৯ |
| চিরাংগ | ৫,৫৭০ | ৬৬,৯৮৭ |
| বাকসা | ৭,৫৬২ | ৮,২৫২ |
| উদালগিরি | ৫,৭২১ | ১৬,৫৩৪ |
| মোট | ৩৯,২৭৬ | ২,৩২,০৪২ (জমি বিঘা অনুসারে) |

বি টি সি প্রধান হাগ্রামা মহিলারিও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, দখলকারীদের বেশীরভাগই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী।

# চাপা উত্তেজনা রয়েছে ধুবড়িতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারত থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চক্রান্তমূলক অপপ্রচারে ফিরে এসেছে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ। তাদের ভয় দূর করে বিশ্বাস অর্জনের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ স্বয়ং। দেখা যাচ্ছে ওই হতভাগ্য মানুষেরা নিজ রাজ্যের সরকারের প্রতিও পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেনি। কেননা মাত্র ৩৫০ জন নাম নথিভুক্ত করেছেন এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। অথচ সরকারের মতে, ফেরৎ আসা লোকজনের অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় কুড়ি হাজারই অসমবাসী।

কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটি সফরে এসে নির্ভয়ে সকলকে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়া তিনি অসম সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তবে কর্ণাটক ও অসম সরকারের আশ্বাসে খুব একটা কাজ হয়নি। তবুও গত ১ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে রওনা হয়েছে। গত ৮-১০ সেপ্টেম্বর অন্য দুটি ট্রেনও (নিঃশুল্ক) যাত্রী নিয়ে রওনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে রাজ্যে সরকারের অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবিকা ও জীবন-যাপনের নিরাপত্তা নিয়ে আরও একটু সক্রিয় হওয়া দরকার। ভারতের সংবিধান যে কোনও ভারতীয় নাগরিককে ভারতের সর্বত্র বসবাস ও জীবিকা অর্জনের অধিকার দিয়েছে। সরকারকেই এটা সুনিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে ধুবড়িতে গণ্ডগোল থেমেও থামেনি। গত ৫ সেপ্টেম্বর ধুবড়ি শহরে একটি কালীমন্দিরের সব গহনাপত্র চুরি হয়েছে। অপবিত্র ও ভাঙচুর করাও হয়েছে। পরদিন নজরে আসতেই স্থানীয় হিন্দুরা পথ অবরোধ করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠলেও চোর ধরা পড়েনি বা গ্রেপ্তারও হয়নি। শহরে চাপা উত্তেজনা, শান্তি বজায় রাখতে রাত্রিকালীন কার্ফুজারি করা হয়েছে। অর্থাৎ দুষ্কৃতকারীরা থেমে নেই বা বসে নেই। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সরকারকে কড়া পদক্ষেপ না নিলে পুনরায় পরিস্থিতির অবনতি হয়ে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।


## এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

# মহাভারত : মুখোশ উন্মোচন পর্ব

**শিবাজী গুপ্ত**

সারাদেশে এখন মুখোশ উন্মোচন পর্ব চলছে। মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে শেষ হয়েছিল। বর্তমানের মেরা ভারত মহান নামে নবমহাভারত কাব্যে মুখোশ উন্মোচন পর্ব নামে একটা নতুন পর্ব সংযোজিত হতে পারে। দেশে যে কত শ্রেণীর মুখোশধারী রয়েছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। সমাজে জাতের সংখ্যা নিরুপণ যেমন কঠিন, মুখোশধারীর সংখ্যা নির্ণয়ও তেমনি কষ্টকর। ভোরে চোখ খোলা থেকে রাতে চোখ বোঁজা পর্যন্ত মানুষ মুখোশধারীদের সাহচর্যে কাটাচ্ছে এবং সে যে সর্বক্ষণ মুখোশাবৃত পরিবেষ্টিত হয়ে আছে তাও বুঝতে পাচ্ছে না। কারণ, যেমন আমরা সবাই চোরা আমাদের এই চোরের রাজত্বে, তেমনি আমরা সবাই মুখোশধারী এই মুখোশধারীর রাজত্বে।

মুখোশ শুধু ছৌ-নাচ বা কথাকলি নৃত্যের শিল্পীরাই ব্যবহার করে না। তাদের মুখোশের একটা আলাদা তাৎপর্য, ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য রয়েছে। গান্ধী টুপির মতো জৌলুষহীন নয়, নিজে না পরে অন্যকে পরানোর বিদ্যায় পারদর্শী নয়।

মুখোশধারীদের মধ্যে রয়েছে দারুণ ঐক্য ও সংহতি। এরা কেউ কারও মুখোশ উন্মোচন করে না বরং কোনওপ্রকারে মুখোশ যাতে খসে না পড়ে সেজন্য একে অন্যের মুখোশ শক্ত হাতে এঁটে দেয় সেঁটে দেয়। কারণ তারা 'ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য' নীতিতে বিশ্বাসী। পরস্পরের মধ্যে বাক্যে বা কথায় ঐক্য থাকলে মাণিক্য হাতড়াতে কতই না সুবিধা। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের টাকা মাটি, মাটি টাকার মতো বিদ্যাসাগরের ঐক্য-বাক্য- মাণিক্যও গভীর ইঙ্গিত বাহী। বর্ণ পরিচয়-এর এই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণে যারা ভুল করে, তারাই চলার পথের সঠিক নিশানা খুঁজে পায় না— যত মত তত পথের ধাঁধায় পড়ে ঘুরে মরে। যেমন স্বয়ং লেখকও মুখোশের আড়ালের মুখগুলির সন্ধান না করে মুখোশ তত্ত্বে মেতে গেছেন। বাস্তব জগতে মানুষ সমেত সমগ্র জীবকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই মুখোশধারী জীব। অন্যান্য জীবের মধ্যে সিংহচর্মাবৃত গর্দভ, নীলবর্ণ- শৃগাল কিংবা ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের কথা শোনা গেলেও তাদের ছদ্মবেশ স্বল্পস্থায়ী হয়েছে, যথেষ্ট আক্কেল সেলামী দিয়ে স্বরূপে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু মুখোশধারী মনুষ্যকুল দীর্ঘকাল, এমনকি সারাজীবনই মুখোশ পরে লোকের চোখে ধূলা দিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। বৃহত্তর সমাজ তাদের মুখোশ উন্মোচন করা তো দূরের কথা জেনেশুনেই মুখোশধারীদের খপ্পরে পড়ছে।

না পড়েই বা উপায় কি? যে সমাজে সর্বস্তরে মুখোশধারীরা কিলবিল করছে, সে সমাজে বাস করে মুখোশধারীদের ছোঁয়াচ এড়াবার কি উপায় আছে? এড়িয়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, বাতাসে ভ্রাম্যমান শুঁয়াপোকার মতো কখন অজান্তে এসে গায়ে বসবে তা টের পাবার উপায় নেই। যখন জ্বলুনি শুরু হবে তখন চুলকানিই সার। অতিষ্ঠ করে ছাড়বে।

কত ধরনের মুখোশধারী যে আছে তা শুনতে গেলে ধারাপাত শেষ হয়ে যাবে। গোড়া থেকেই শুরু করা যেতে পারে। তৃণমূল স্তরে জনজীবন নিয়ন্ত্রণ করছে পঞ্চায়েত। প্রয়োজনে তাদের কাছে গেলে তারা আপনার রঙ বাছতে শুরু করবে। আপনি কোন রঙের মুখোশ পরেন সেটাই বিবেচ্য— আপনার প্রয়োজন নয়। এই পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিধানসভা, লোকসভা, এম এল এ, এমপি, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রী, চেয়ারপার্সন, এমন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত সবাই মুখোশধারী। তারা যে মন্ত্র পড়ে শপথ নেয়, সেপথে কখনও হাটে না— সবাই স্ব-পথ দেখে যে পথে আমদানি তেজী, সেখানেই শপথের মান মন্দী। কেউ কারও মুখোশ খোলার চেষ্টা করে না!' দেখেশুনে মনে হচ্ছিল স্বয়ং ভগবানও মুখোশ পরে আছেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত ভগবান মুখোশ ত্যাগ করে মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন যে যার মুখোশ খুলতে বাধ্য হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষকের মুখোশ খুলছে, অধ্যাপক-অধ্যাপকের মুখোশ খুলছে, সরকারি কর্মচারীদের মুখোশ একে একে খসে পড়ছে। উকিল ব্যারিস্টার জজসাহেব— সবার মুখোশের বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। রোগীরা ডাক্তারদের মুখোশ খুলছে। ছাত্ররা মাস্টারদের মুখোশ খুলছে। খদ্দের দোকানদারের মুখোশ খুলছে, সাধারণ কর্মীরা নেতা-নেত্রীর মুখোশ খুলছে, মক্কেলরা আইনজীবীর মুখোশ খুলছে, এম এল এ/এম পি-রা মন্ত্রীদের মুখোশ খুলছে, শিল্পপতিরা সরকারের মুখোশ খুলছে। মালিক শ্রমিকের মুখোশ খুলছে, শ্রমিক মালিকের মুখোশ খুলছে।

আর এদিকে বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবীর মুখোশ খুলছে, সিপিআই বিরোধী পক্ষের মুখোশ খুলছে, সি এ জি সরকার পক্ষের মুখোশ খুলছে, সাহিত্যিক সাহিত্যেকের মুখোশ খুলছে। আর বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লেখিকা তসলিমা নাসরিন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের শুধু মুখোশ নয়, একেবারে প্যান্টালুন খুলে জনসমাজে বেইজ্জত করে ছেড়েছেন। হস্তিনাপুরে কৌরব রাজসভায় পাণ্ডব-কুলবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রচেষ্টার চেয়ে তা কোনও মতেই কম লজ্জাকর নয়। এই দ্বিচারী বুদ্ধিজীবীদের লজ্জা দেবার মতো আরেক খণ্ড 'লজ্জা' উপন্যাস লেখায় বরং হাত দিন তসলিমা নাসরিন।

# দেবস্থানে সারমেয়

অন্য রকম

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** বেশ কিছুদিন আগে জনৈক সহকর্মীর একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দেখার সুযোগ হয়েছিল। হিন্দু পুরাণে ও ধর্মশাস্ত্রে গোরুর মতো না হলেও সারমেয়র স্থান যে খুব কম কিছু নয় তাই ছিল পাণ্ডুলিপিটির প্রতিপাদ্য। বিষয়টির অভিনবত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে কুকুরের প্রভুভক্তি আমাদের যতটা প্রিয় বিষয়, আমাদের কুকুর-ভক্তি কিন্তু নাক-সিঁটকোনোর বেশি আর অতিরিক্ত কোনও মর্যাদা দাবি করতে পারে না। পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় খানপুর গ্রামে একটি সুপ্রাচীন শিব মন্দিরের কথা পাঠকের গোচরে আনা প্রয়োজন যাতে এই ধ্বন্দের অবসান হতে পারে। মন্দিরের মোহান্তের নাম অজয় গিরি। সকাল- বিকেল তাঁকে দেখা যায় মন্দির চত্বরে পরিভ্রমণ করতে আর মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় 'আঃ আঃ, উঃ উঃ' ইত্যাদি। এহেন স্বরবর্ণ-ব্যাঞ্জনবর্ণের সমাহারে যাদের উদ্দেশে তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত এরকম কেকাধ্বনি, তারা হলো, কম করেও গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশেক সারমেয়। জাতটা তাদের জার্মান শেফার্ড বা অ্যালসেশিয়ান কিংবা ডোবারম্যান নয়। যে কুকুরপ্রেমী সংগঠনের বরদহস্ত তাদের মাথায় থাকবে। আর শহুরে ড্রয়িংরুমে দিব্যি পাঁঠা-মুরগীর ঠ্যাং চেবানো চলবে। এরা হলো গিয়ে চলতি কথায় নেড়িসেশিয়ান। অর্থাৎ রাস্তার নেড়ি কুকুর। নিখাদ দেশী, তাই কোনও কুকুরপ্রেমী সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এরা সক্ষম হয় না। পথের প্রান্তে এক কোণে কোনওরকমে পড়ে থাকে। মাথা গোঁজার ঠাঁই এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় খাবারটুকুও জোটে না এই অবলাদের। এহেন জীবেদের প্রাণ না দিলেও তিনবেলা আহার দেবার আয়োজন সেরে ফেলেছেন অজয় গিরি মহারাজ। আহার মানে রীতিমতো ভোজ কয় যাহারে। রুটি, সবজির তরকারি, ডাল ও লস্যি। এমন রাজকীয় ভোজনে সেই রাস্তার অবলা জীবগুলির উদরপূর্তি যে কীরকম সন্তুষ্টিজনক হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

*মোহন্ত অজয় সিং-এর কুকুরদের উদ্দেশ্যে রাজকীয় ভোজ— লস্যি প্রদান।*

তবে স্রেফ প্রকৃত সারমেয়-দরদের জন্য কিন্তু এতকিছু করছেন না গিরি মহারাজ। শিব-মন্দিরের সুদীর্ঘ পরম্পরায় এখানে সারমেয়র একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে। স্বয়ং মোহন্ত অজয় গিরির মুখেই শুনুন সেই কথা, ''বাবা আলা সিংয়ের সময় যখন তিনি পাতিয়ালার শাসক ছিলেন, সতেরো শতকের কোনও এক সময়ে খানপুর গ্রামে তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রবেশ করেন তিনি। তৎকালীন মন্দিরের পূজারী মোহন্ত ভগবান গিরি তাদের খাদ্যগ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। শাসক একটি আদেশনামা জারি করেন। তাতে বলা হয় তাঁর শাসনাধীন ১২টি গ্রামের (যার মধ্যে খানপুরও অন্যতম) সংগৃহীত খাজনা মন্দিরে আসবে। আলা সিং ও তাঁর সৈন্যসামন্তরা মন্দির ত্যাগ করার সময় একদল কুকুর তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেই কুকুরদেরই একটি ছিঁড়ে দেয় যে কাগজে লেখা হয়েছিল ওই আদেশনামার কিছু অংশ। আদেশনামার যে অংশটি বেঁচে যায় তাতে গোটা তিনেক গ্রামের নাম ছিল। কুকুরটিকে ধরতে গেলে কুকুরটি পালিয়ে যায় এবং ১৭৫ বিঘে জমি প্রদক্ষিণ করে। মোহন্ত ভগবান গিরির অনুরোধে বাবা আলা সিং সিদ্ধান্ত নেন মন্দিরে ওই তিন গ্রামের সংগৃহীত খাজনা-ই যাবে এবং ১৭৫ বিঘে সারমেয়-প্রদক্ষিত জমিটি সারমেয়র নামেই উৎসর্গ করে দেওয়া হবে।'' তিনশ' বছরের এই সারমেয়-প্রেমের ধারাই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন মোহন্ত অজয় গিরি।

এমনকী আজও ওই ১৭৫ বিঘে জমি কুকুরের নামেই সরকারিভাবে পঞ্জীকৃত রয়েছে। উর্দুতে লেখা পুরনো রেকর্ড উদ্ধার করে স্থানীয় 'তহশীলদার' জানাচ্ছেন, ''এই জমি বিক্রিও করা যাবে না, কারুর নামে পরিবর্তন করাও যাবে না।'' এই সুবিশাল জমিতে এখন গম-ভুট্টা চায় হয়, কুকুর ও ভক্তদের যার ওপর অধিকার। উদ্বৃত্ত বিক্রি হয়ে মন্দিরের কাজে লাগে। শিবমন্দিরে মানুষ ও অবলা জীব-জন্তু দু'য়েরই সমানাধিকার। মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে পুরোহিতের পদতলে কুকুরদের বসে থাকা জানিয়ে দেয় দেবস্থানে সারমেয়র স্থান কতটা উঁচুতে।

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

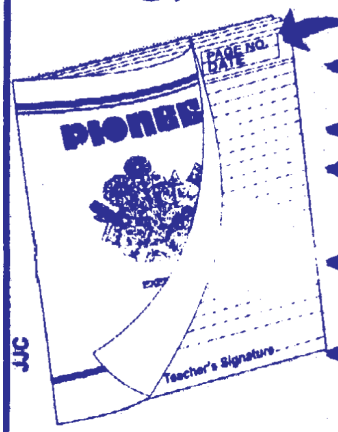



প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।

◀ পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।

◀ আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।

◀ ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।

◀ প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।

◀ ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।

◀ প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature...................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®

সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের

ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে ৈির
তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর
ফোন – (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

নেত্রদান মহাদান

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

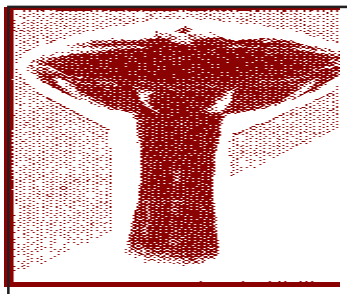



Design's For Modern Living

Neycer

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

Sales Office : 15, College Street,
Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. :
2210-5831 / 33

# মালদাতে ক্রীড়াভারতী'র সারাদিনের কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি গত ৯ সেপ্টেম্বর মালদার বৃন্দাবনী মাঠে ক্রীড়াভারতী'র উদ্যোগে সারাদিনব্যাপী কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। জেলার মোট ১৮টি স্কুলের এবং সঙ্ঘশাখার ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ২৭০ জন কিশোর-কিশোরী প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন ক্রীড়াব্যক্তিত্ব এবং ক্রীড়ানুরাগী ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। অনেকে সারাদিনব্যাপী সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত থেকেছেন। খেলা পরিচালনা করেছেন।

প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ডালনা চন্দ্রমোহন বিদ্যামন্দির, যদুপুর হাইস্কুল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদিনা শাখা, ঋষিপুর উচ্চবিদ্যালয়, নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের টিম বিভিন্ন বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকার, মিহির মিশ্র, জেলা ক্রীড়া সঙ্ঘের (ডি এস এ) সুভাশিস সরকার, গোবিন্দ বসাক এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অহিভূষণ দাস বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়াভারতী'র পশ্চিমবঙ্গের সংযোজক মধুময় নাথ এবং উত্তরবঙ্গ সংযোজক বিশ্বজিৎ বর্মন-পুরো সময় উপস্থিত থেকে খেলাধূলা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

## শোকসংবাদ

গত ৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির স্বয়ংসেবক শ্রী কৈলাশ রামপুরিয়ার সহধর্মিনী শ্রীমতি কৌশল্যাদেবী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

## বার্ষিক গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন

ডাকযোগে যাঁরা স্বস্তিকা নেন, তাঁরা প্রতি কপির উপরে কাগজে লেখা গ্রাহক নম্বর এবং মেয়াদ শেষের তারিখ দেখে সেই অনুসারে মেয়াদ শেষের এক মাসের মধ্যে মনিঅর্ডার কিংবা অন্য উপায়ে পরবর্তী বছরের নবীকরণের জন্য গ্রাহক মূল্য পাঠিয়ে রসিদ সংগ্রহ করবেন। পুরনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর লিখে পাঠাবেন। যদি কোনও কারণে নবীকরণ করা সম্ভব না হয় তাও সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে জানাবেন। নতুনদের ক্ষেত্রে পুরো নাম-ঠিকানা (পিন সহ) ও টাকা পাঠিয়ে রসিদ নেবেন।

□ □ □ □ □

যাঁরা এজেন্টদের মাধ্যমে স্বস্তিকা পেয়ে থাকেন, তাঁরা তাঁদের বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদের তারিখ এজেন্টের কাছে জেনে নিয়ে এক মাসের মধ্যে এজেন্টের মাধ্যমে নবীকরণের টাকা জমা করে তার মাধ্যমেই রসিদ সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে নবীকরণ সম্ভব না হলে এজেন্টদের মাধ্যমে কার্যালয়ে জানাবেন। পুনরায় যখন গ্রাহক মূল্য জমা দেবেন সেই সময় থেকে পত্রিকা আবার চালু করা হবে। এজেন্টের সঙ্গে সবদিক থেকে সহযোগিতা ও যোগাযোগ রাখতে পারলে ভালো। সর্বত্রই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। আপনার নিকটবর্তী এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য তার ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখা ভালো। উল্লেখ্য, স্বস্তিকা থেকে এজেন্টকে গ্রাহকদের তালিকা পাঠানো হয়ে থাকে।

**—ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা**

# দলে হিরো-দেশে জিরো

**দেবব্রত চৌধুরী**

আগামী দিনের 'কাণ্ডারী' হিসেবে কংগ্রেস দল ভারতীয় রাজনীতিতে রাহুল গান্ধীকেই তুলে ধরতে চাইছে। তাঁকেই ভারতবর্ষের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রচার করে চলেছে। কারণ তিনিই নেহরু গান্ধী পরিবারের একমাত্র প্রতিনিধি এবং দেশজোড়া কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের কাছে একমাত্র ভরসা। রাহুল নাকি দেশের যুব-সমাজের ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু তিনি নিজের জীবন নিয়ে অদ্ভুত নিশ্চুপ। নিজের শিক্ষা, বিদেশে চাকুরী-প্রেম এমনকি নিজের বিয়ের ব্যাপারেও মুখ খোলেন না। রাজনীতিক হিসাবে তাঁর কি লক্ষ্য তাও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। তিনি যে দলের প্রবীণ নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তার প্রমাণও দেশবাসীকে আজও দেখাতে পারেননি।

তাই মার্কিন পত্রিকা 'দি ইকনমিস্ট' একটি প্রবন্ধ লিখেছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'দি রাহুল প্রবলেম'। এই প্রবন্ধে রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও তার দূরদর্শিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে মার্কিন পত্রিকাটি। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধীর মধ্যে একজন উঁচুমানের রাজনীতিকের জেদ উদ্যম সংগঠনিক ক্ষমতা সর্বোপরি পদের প্রতি সুবিচারের ইচ্ছা আজও দেখা যায়নি, কিসে তিনি দক্ষ, মানে সামাজিক উন্নতি অর্থনীতি শিল্পনীতি বিদেশনীতি শিক্ষানীতি যুবকল্যাণ এমনকি খেলাধূলার নীতিতেও তার কোনও প্রকাশ আজও দেখা যায়নি। বরং বেশ কিছু নেতা তার সম্বন্ধে বলেন, রাহুল গান্ধীর বিশেষ পরিচয় কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া তনয় হিসেবে। কংগ্রেস তথা ইউ পি এ সরকারকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করা সমাজবাদী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোহন সিং গত ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দাড়িয়ে সাংবাদিকদের বলে গেলেন 'রাহুল গান্ধীর দেশ চালানোর কোনও ক্ষমতাই নেই।' অথচ নেহরু পরিবারের ভৃত্যসম স্তাবক কংগ্রেস নেতারা বলেছেন রাহুল গান্ধীই দেশের ভবিষ্যতে যোগ্যতম প্রধানমন্ত্রী। কি কারণে এই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের নেতারা তার কোনও কারণ দর্শাতে পারেননি কংগ্রেস দল আজও। তাই কংগ্রেস পার্টি দেশের বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে পরিহাসের বস্তু হয়ে পড়েছে। এছাড়াও রাহুল গান্ধী সম্পর্কে অনেক চাঞ্চল্যকর খবর বাজারে চালু হয়ে গেছে।

ডঃ সুব্রামানিয়ম স্বামী বলেছেন রাহুল গান্ধী তাঁর বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী প্রথমে বলেছিলেন তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M.Phil করেছেন। কিন্তু সুব্রামানিয়ম স্বামী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে খবর নিয়ে জেনেছেন রাহুল গান্ধীর নামে M.Phil করার জন্য কোনও থিসিস আজও পর্যন্ত জমা পড়েনি। তবে লন্ডনের বিখ্যাত ভারতীয় ধনী হিন্দুজা গ্রুপ ১১ মিলিয়ন ডলার দিয়ে রাহুলকে হার্ভাড মেডিকেল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাহুল গান্ধী ওই স্কুলে মাত্র তিন মাস থাকার পর ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। সুব্রামনিয়াম স্বামী প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধী তাঁর ভূয়ো শিক্ষা সম্বন্ধে কেন দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়েছেন। (সূত্র : LHP// garophiheritogo.org)

রাহুল গান্ধীর ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রাহুল গান্ধী ১৯৯০ সালে জন্মেছেন যখন তাঁর মা সোনিয়া গান্ধী ইতালীর নাগরিক ছিলেন। সেই হিসেবে রাহুল ইতালীর নাগরিকত্ব নেন এবং তাঁর পাশপোর্টে নাম ঘোষণা করা হয়— রাহুল ভিন্সি, নাগরিক-ইতালী, ধর্মে ক্যাথলিক খৃস্টান এবং খৃস্টান হওয়ার সুবাদে Ori. ১০ অন্তর্গত Rolling Mission by College-এ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। তাছাড়াও নিজেকে এক Rifle Shootter ঘোষণা করে Sportsmen কোটায় কলেজে সুযোগ নেন। সুব্রামনিয়ম স্বামী অভিযোগ তুলেছেন রাহুল গান্ধী একজন শিক্ষার্থী যুবক। (সূত্র : LHP/vivekjotiblogspot.com./ 2011/104/rahul- gandhi or corruption.html)

শ্রীস্বামী বিদেশী অর্থনীতি ভঙ্গ করার অভিযোগও এনেছেন রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে। একবার রাহুল গান্ধীকে আমেরিকার বোস্টন শহরের বিমানবন্দরে বিদেশী অর্থনীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে অ্যারেস্ট করা হয়।

আমেরিকার দেশে প্রচলিত বিদেশী অর্থনীতি অনুযায়ী ১০,০০০ ডলার নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু প্রাক্ ঘোষণা না করে রাহুল গান্ধী ভিন্সী ১,৬০,০০০ ডলার নিয়ে বোস্টন বন্দরে আনেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন ডেরোনিক কারটোবলী নামে এক কলোম্বোরি যুবতী। তার বাবা কারটোবলী একজন ড্রাগ মাফিয়া নামে খ্যাত। বিশাল বন্দরে রাহুলের নামে বিমান কর্তৃপক্ষ একটি এফ বি আই (ইন্ডিয়া মতে এফ আই আর) করে এবং ৯ ঘণ্টা বিমান বন্দরে আটকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে ভারত-আমেরিকা রাজনৈতিক সম্পর্ক যাতে অক্ষত থাকে সেইজন্য আমেরিকার বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইস নিজে হস্তক্ষেপ করে রাহুল গান্ধীকে মুক্ত করে দেন। এ খবর রাহুল দেশে প্রচার হতে দেননি।

আরও অভিযোগ আছে— রাহুল গান্ধী দিল্লীর তুঘলক্ রোডে এক সাংসদের বাংলোয় থাকেন আর সঙ্গে তার জীবনসঙ্গিনী এক বিদেশিনী নারী। নাম ডেরোনিকিউ। ইনি রাহুলের যদি স্ত্রী হন ঘোষণা করতে তাহলে দ্বিধা কেন? স্ত্রী বা জীবনসঙ্গিনী যদি বিদেশিনী হয় তবে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ না করে, এই ভয়ে, যদি প্রধানমন্ত্রিত্ব পেতে এ ঘটনা অসুবিধা সৃষ্টি করবে বলে ভেবে থাকেন তবে রাহুল গান্ধী মিথ্যাশ্রয়ী, বিদেশী-নাগরিক, সীমিত বিদ্যাধারী, আইন লঙ্ঘনকারী, বিবাহ না করে জীবনসঙ্গিনী করে রাখা যা ভারতীয় রীতি বিরোধী। তাকে ভারতীয় কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা প্রধানমন্ত্রী করতে আজ পাগলের মতো উঠে পড়ে দৌড়চ্ছেন কেন? রাজনীতিতে আসার পর ৮/৯ বৎসর পার করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী, বেশ কয়েটি পরীক্ষার সুযোগ পেয়েও একবারেই সফল হতে পারেননি রাহুল। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনে একক দায়িত্ব পেয়েও দলের মুখ পুড়িয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাই হয়তো 'দি ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখেছেন 'দি রাহুল প্রবলেম'।

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের বিচারে সবার কাছে 'রাহুল' জিরো হলেও দলের কাছে তিনি হিরো।

# পাকিস্তান ঐতিহাসিক কাটাসরাজ মন্দিরের জীর্ণদ্বারের সংস্কার করছে

**ফিরোজ বকত আহমেদ**

দু'মাস পাকিস্তানে ঘোরার পর ভারতে আসছিল মিশেল। পর্তুগালে বাড়ি। মহিলা পর্যটক। দেশ দেখার টানে বেরিয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে তার দেখা আটারী-ওয়াঘা সীমান্তে। আমি পাকিস্তানে যাওয়ার পাসপোর্ট দেখানোর জন্যে যখন নির্দিষ্ট জানলায় পৌঁছেছি তখন দেখা হলো মিশেলের সঙ্গে। এক দেশ সে দেখে ফিরছে, আর আমি দেখতে যাচ্ছি। সে বলল, পাকিস্তানের অনেক জায়গায় ঘুরেছে। আর পর্যটকরূপে পাকিস্তানে যা দেখেছে তা তাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। সে বলতে চাইল, রক্তপিপাসু আতঙ্কবাদী আর ভ্রষ্ট নেতাদের বাদ দিয়ে যদি পাকিস্তানের ব্যাপারে ভাবা যায় তাহলে দেখা যাবে জায়গাটা অদ্ভুত। কিন্তু বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে এখনও কোনও গুরুত্ব পায়নি।

পাকিস্তানে পৌঁছোবার পর মিশেল-এর কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরছিল। আমার পাকিস্তানে যাওয়ার মূল কাজ শেষ করে সে দেশের বৈদিক মন্দির আর ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখা শুরু করলাম।

আমাকে বলা হয়েছিল, অবশ্যই যাবেন কটাসরাজ মন্দিরে। এই মন্দির পাঞ্জাবের চকবাল জেলার কটাস গ্রামে। পূর্ব ইসলামাবাদের সল্ট রেনজ-এর পূর্ব দিকে এই মন্দির কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন। পরম্পরা বাহিত নাম সতঘড়া মন্দির। ইসলামাবাদ থেকে লাহোর সড়ক পথ তৈরির পরে ওই মন্দির হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল। বল্লরকহার সরোবর থেকে যাওয়ার পথে রাস্তার উপর পড়ে। কল্লরকহার সরোবর থেকে বেশি দূরে নয়। জানা যায় এই হিন্দু মন্দির নবম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে তৈরি হয়েছিল। যে সময় কাশ্মীরে শক্তিশালী হিন্দু রাজা শাসনক্ষমতায় ছিলেন। এই মন্দির চত্বরে অনেক মন্দির ছিল। দুর্ভাগ্য অধিকাংশ মন্দিরের অবস্থা এখন খুব খারাপ।

সামনে একটা জলাশয় আছে। দেখে মনে হলো জল খুব পরিস্কার নির্মল ও স্বচ্ছ। ওই পুকুর মামুলি পুকুর নয়। রীতিমতো আশ্চর্যজনক বইকি। নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রাচীন বৈদিক মন্দিরের অন্যতম কাটাস। আমি ভারতে মীনাক্ষি, পুরী, অক্ষরধাম, গণপতি ও অন্যান্য মন্দির দেখেছি। কিন্তু কাটাসরাজ মন্দিরের সঙ্গে কোনও মন্দিরের তুলনা চলে না।

ভগবান শিব এই মন্দিরের আরাধ্য দেবতা। অনুমান মহাভারতের রচনার কাছাকাছি সময়ে মন্দির গড়ে উঠেছিল। বলা হয় পাণ্ডবরা বসবাসকালে বেশিরভাগ সময়ই ওইখানে ছিল। পাকিস্তান সরকার এই স্থানটিকে পৃথিবীর বিখ্যাত স্থানের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। মন্দিরে জীর্ণ হওয়া মূল প্রবেশপথ যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তিন ভাগের দুভাগ কাজ হয়ে গেছে। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। জনশ্রুতি, যখন পত্নী পার্বতীর মৃত্যু হয় তখন শিব দুঃখে এত কাতর হন যে তাঁর চোখের জলে জলাশয় তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে অন্য একটি জলাশয় তৈরি হয়েছিল আজমীরের পুষ্করে। প্রাচীন স্মৃতিবহন করছে ওই এলাকা। সবসময় বইছে তাজা জলস্রোত। এছাড়া জলাশয়ের আশপাশের কয়েক হাজার একর জুড়ে থাকা বাগানের গাছগুলো সঞ্জীবিত হয়।

জেনারেল ক্যানিংহাম বলেছেন, জ্বালামুখীর পরে কাটাসরাজ দ্বিতীয় সব থেকে বড় পবিত্র মন্দির। বলা হয় পাণ্ডবরা ওইখানে বনবাসকালে বা সতঘড়া মন্দির তৈরি করে। আলবেরুনীও এখানকার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত শিখেছিলেন আর সেখান থেকে নিজের বই কিতাব-উল-হিন্দ লিখেছিলেন। সেই বইটিতে তৎকালীন ধর্মীয় পরিবেশ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, হিন্দুদের সামাজিক পরম্পরা ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। বিখ্যাত সাধক পরেশনাথ যোগী সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গুরুনানকও সেখানে এসেছিলেন। কটাসকে পরে নানক নিবাসও বলা হোত। যেখানে দলে দলে সাধু-সন্ন্যাসী, সাধক ও মহান পুরুষরা থাকতেন। বলা হয়, ওখানকার পুকুরে স্নান করলে সব পাপ দূর হয়ে যায়। এখন কটাস মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ সরকারি তরফ থেকে পাঞ্জাবের পুরাতত্ত্ব বিভাগকে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০১০ সালে ওখানে গিয়েছিলাম। তখন দুর্দশা দেখে ব্যথিত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং অনেক উচ্চপদের ব্যক্তিকে চিঠি লিখে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমার কোনও চিঠির উত্তর পাইনি। কিন্তু এবছর মে মাসে পুনর্যাত্রার সময় জানতে পারলাম আমি চিঠি লেখার পর এই স্থানটিকে পাকিস্তান সরকার বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থানের অন্তর্ভুক্ত করায় উদ্যোগ শুধু নেয়নি, তার ভগ্ন প্রায় প্রবেশ পথের সংস্কারের কাজ করেছে।

তবে এতেই কাটাসরাজের দুঃসময় শেষ হয়ে যায়নি। কাটাসরাজ মন্দির কমিটির

সংগঠক পণ্ডিত জাভেদ আক্রম কুমার বলেছেন, এই ঐতিহাসিক মন্দিরে যত পবিত্র দ্রষ্টব্য ছিল তার অধিকাংশ চুরি হয়ে গেছে। শুধু পাথরের একটি মূর্তি রক্ষা পেয়েছে। তস্কররা সেদিকে নজর রেখেছে আর সবসময় ভয় দেখাচ্ছে।

পণ্ডিত কুমার বলেছেন পাঞ্জাবের পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরের সংশোধনের ব্যাপারে জোরালো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। মন্দির বহুকাল ধরে চোরদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়েছে সরাসরি তত্ত্বাবধানের অভাবে। সেখান থেকে প্রাচীনমূর্তি চুরি গেছে। একটি শিবমূর্তি এখনও চোরদের নিশানা থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তারা সেটিও চুরির চেষ্টা সবসময় চালাচ্ছে। সেজন্যে বিপদ আছে প্রতিমুহূর্তে।

শ্রীকুমার বলতে চান এই মন্দির অত্যন্ত বড় তীর্থস্থান হওয়ার দরুন পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এদিকে কখনও নজর দেয়নি। এই মন্দির পাকিস্তানের প্রাচীন স্থলগুলির একটি। কাটাস ঘাটী তার সৌন্দর্যের জন্যে কয়েক শতাব্দী ধরে প্রসিদ্ধ। সে ওখানে এক বড় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অনেক মহান সংস্কৃত বিদ্বান সেখানে শিক্ষালাভ করেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃতির সপক্ষে কথা বললেন লাহোর নিবাসী অফলান খান— এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার আজ পর্যন্ত কোনও সরকারই এই আশ্চর্যসুন্দর স্থানটিকে পুনরায় সৌন্দর্যময় করে তুলতে উদ্যোগ নেয়নি। এখানে আজও এখন বহু জিনিস আছে যা সারা পৃথিবীর পর্যটকদের সেখানে আকর্ষণ করতে পারে।

ভালো হয় যদি সরকার পাকিস্তানের অন্যান্য মন্দিরের জীর্ণ অবস্থার সংস্কার করে যেমন করছে কাটাসরাজ-এ। এখানে কয়েক লক্ষ হিন্দু তীর্থযাত্রী আসতে পারেন। সরকারের তাতে আয় বাড়বে। সেই সঙ্গে দু' দেশের মৈত্রীবন্ধন জোগানো হতে পারে।

পাকিস্তান সরকার পর্যটনকে গুরুত্ব দিচ্ছে এটা আমি লক্ষ্য করেছি। নিজে কিন্তু তারা বিভিন্ন স্থানের উন্নয়নে অর্থব্যয়ে নারাজ, আর সেই স্থানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারেও ভাবতে চায় না। যদি একটু গভীরভাবে ভাবা যায় তাহলে দেখা যায় এখন পাকিস্তানে বেড়াতে যায় এমন লোকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। মন্দির সংস্কার হলে আর পর্যটকদের আহ্বান জানালে লাখে লাখে লোক বেড়াতে যাবে। আর সেটা বড় সুখের ও সৌভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে।

*(লেখক মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কলেজের শিক্ষক।)*

*সৌজন্যে : হিন্দুবিশ্ব*

# 'বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনা'র এক সন্ধ্যায় দুটি নাটক

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

গত ১ সেপ্টেম্বর গিরিশ মঞ্চে 'বালিগঞ্জ স্বপ্নসূচনা' দুটি ছোট নাটক অভিনয় করল।

প্রথমার্ধে বিখ্যাত নাট্যকার এবং অভিনেতা মনোজ মিত্র রচিত 'গন্ধজালে' নাটকটি অভিনীত হলো। এই নাটকের গল্পে অন্ধ মেয়ে পঙ্খী তার দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে এক গ্রামের বাড়িতে বাস করে। নাটকের শুরুতেই অন্ধ পঙ্খী ধর্ষিতা হয় কোনও এক অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতির হাতে। গ্রাম্য সমাজে বদনাম ছড়ানোর আগেই তার দিদি জামাইবাবু আরেক অন্ধ পাত্র নীলকান্তের সঙ্গে পঙ্খীর বিবাহ দিয়ে দেন। বাসর রাতে নীলকান্তের এক বিশেষ ক্ষমতার কথা সকলে জানতে পারে— সে চোখে দেখতে না পেলেও গন্ধের সাহায্যে মানুষ, পশুপাখী সম্বন্ধে সব বলে দিতে পারে। বাসর রাতে একান্তে পঙ্খী সেই দুষ্কৃতির গা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া গেঞ্জির টুকরো দিয়ে অপরাধীকে খুঁজতে বলে নীলকান্তকে। নাটকের শেষে নীলকান্ত আসল দুষ্কৃতিকে চিনতে পারে। অপরাধীটি কে তা জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে এই নাটকটি।

নাটকে নীলকান্তের চরিত্রাভিনেতা খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন। আর অবশ্যই বলতে হয় আলোকসম্পাতের কথা। বিশেষত, একটি বৃষ্টির দৃশ্যে আলোর প্রয়োগ দর্শকদের মুগ্ধ করে। নাটকটির পরিচালক ছিলেন সুবীর মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়ার্ধে অভিনীত হলো অরিন্দম সেনগুপ্ত রচিত এবং রুদ্রতেজ সেনগুপ্ত পরিচালিত নাটক 'তিমির সখা'।

এক প্রয়াত আদর্শবান রাজনীতিকের সংসারের গল্প এই নাটকটি। তার পুত্র কলেজের ওয়েলফেয়ার ফান্ডের টাকা চুরি করে। অপরদিকে মেয়ে তৃষা বিশ্বাস করে একজন মানুষ কখনওই অপর একজনকে ভালোবাসতে পারে না। শুধু ভালোবাসার অভিনয় করে মাত্র। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে বিবাদের পরিণামে সে আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু নাটকের শেষে তাদের এক ভাড়াটে গুণময়বাবুর কথায় তাদের বোধোদয় হয়। গুণময়ের একটা সংলাপ মন কাড়ে— 'মানুষ কখনও একা বাঁচতে পারে না। অন্তত ঝগড়া করার জন্যও তো আরেকটা মানুষকে তার দরকার।" এই নাটকে প্রত্যেকের অভিনয় খুব সুন্দর। যদিও আবহ একটু চড়া মনে হয়েছে। মোটের ওপর দুটি নাটকই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। একই সঙ্গে ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাটক দুটি নিবেদন করেছেন বিজয় মুখোপাধ্যায়।

শব্দরূপ-৬৪২ মল্লিকা মজুমদার

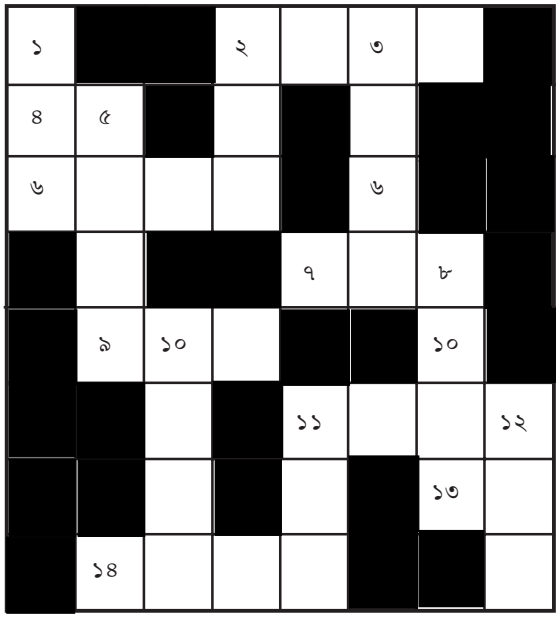


## সূত্র :

**পাশাপাশি :** ২. হাতের লেখা, আগাগোড়া শিব, ৪. একই শব্দে অঙ্কুর, কাকলি, বন্দুকাদির ঘোড়া, ৬. বেলগাছকে এই নামেও বলা যায়, ৭. বিশেষণে কেশহীন, ৯. পুজোর ঋতু, ১১. তৎসম শব্দে বিশেষণে সমান শক্তিমান। ১৩. দেবতার খেলা, প্রমোদ, বিলাস, কেলি, ১৪. দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী বধ।

**উপর-নীচ :** ১. লগা, গাছের ফুলফল পাড়বার বক্রমুখ দণ্ড, ২. প্রতিশব্দে পরিপাক, ব্যঙ্গার্থে আত্মসাৎ করা, ৩. বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ, মধ্যে প্রতিজ্ঞা, ৫. এখানে রাম-এর দুই তনয়, ৮. রাধিকার প্রিয় সখী, ১০. বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ললাটে আঁকা পুষ্পকলির ন্যায় তিলক, ১১. প্রতিশব্দে বুদ্ধিবৃত্তি, বোধি, মতিপ্রকর্ষ, শেষ দুয়ে চেতনা, ১২. তৎসম শব্দে ভূষণ, তিলক।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৬৩৯**
**সঠিক উত্তরদাতা**
**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**
**অমিয় সামন্ত**
**বেলেঘাটা,**
**কলকাতা-১০**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চা | র্বা | ক | ■ | ম | ন্দা | ক্রা | ন্তা |
| স | ■ | পো | লি | ও | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ম | ত | ■ | কা | ন | ম | লা |
| ■ | ন্দা | ■ | ■ | ■ | ■ | হা | ■ |
| ■ | কি | ■ | ■ | ■ | ■ | ল | ■ |
| ক | নী | নি | কা | ■ | গ | য়া | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ম | ক | র | ■ | ঘুঁ |
| অ | তি | ব | লা | ■ | ব | ম্বে | টে |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

□ ৬৪২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০১২ সংখ্যায়


**ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে**

**''চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি''—রীণা দেবনাথ**

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

**''ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—**

**B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.''**

**কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।**

**চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা— (সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।**

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

**দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।**

**মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬**

# ।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ১৪

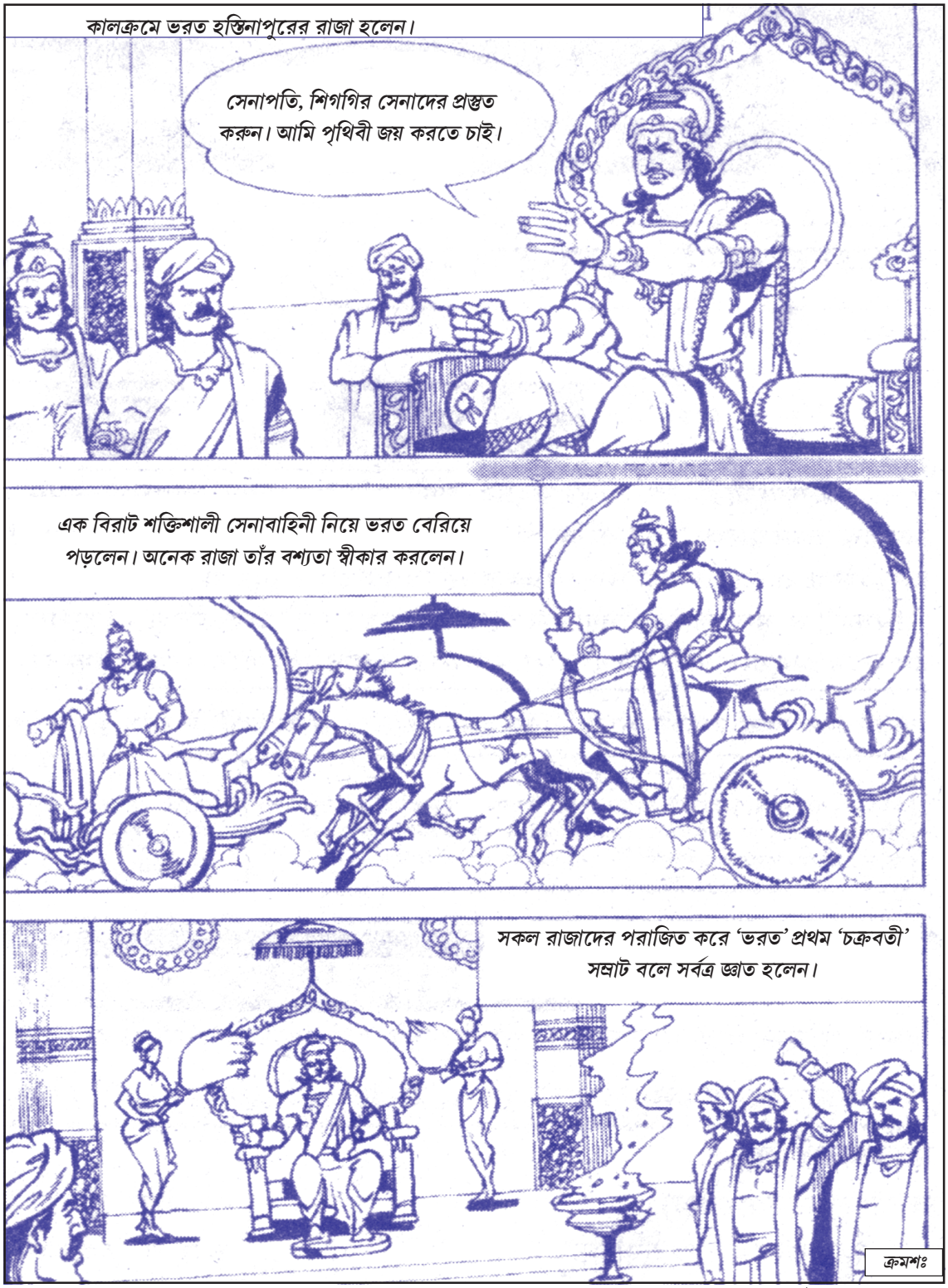


(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

# জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন
# রূপসাগরে অরূপরতন

## স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

### —: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

### --: প্রবন্ধ :—

**আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়**— রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। **তিলকের প্রথম কারাবরণ : শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। **রাষ্ট্রপরিচালনায় 'খড়ের মানুষের' উপদ্রব**— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। **বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ**—তথাগত রায়। **ভারত বনাম ইন্ডিয়া**— অমলেশ মিশ্র। **গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন**— দেবীপ্রসাদ রায়। **বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদর্শন ও জাতীয়তাবোধ**— অচিন্ত্য বিশ্বাস। **রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা**— সমিত দে। **আন্দামান দর্শন**— দীনেশ চন্দ্র সিংহ। **রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** — সত্যনারায়ণ মজুমদার। **রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের শতবর্ষ : দেশে দেশে ডাকঘর**— বিকাশ ভট্টাচার্য। **সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা**— সন্দীপ কুমার দাঁ। **বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা**— অর্ণব নাগ। **মাধেরার সূর্যমন্দির**— সৌমেন নিয়োগী।

### --: গল্প :—

রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

### --: রম্যরচনা :—

**ধামালি**— চণ্ডী লাহিড়ী। **ডি লা গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক ইয়াক**— পিনাকপাণি ঘোষ।

### --: ভ্রমণ :—

**সিন্ধু দর্শনে**— বিজয় আঢ্য।

### --: দেবীবন্দনা :—

**ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী**— ভিক্ষুদেব ভট্ট

*সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা*

সত্বর কপি বুক করুন।

**মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।**

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
24 September - 2012


# FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

**CENTURYPLY**
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

**CENTURYVENEERS**
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

**CENTURYLAMINATES**
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
**CENTURYMDF**
**CENTURYPRELAM**

CENTURYPLY®


দাম : ৭.০০ টাকা